ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল

৬টি বিষয়ের ক্লাস নোট

জুলাই, ২০১৫

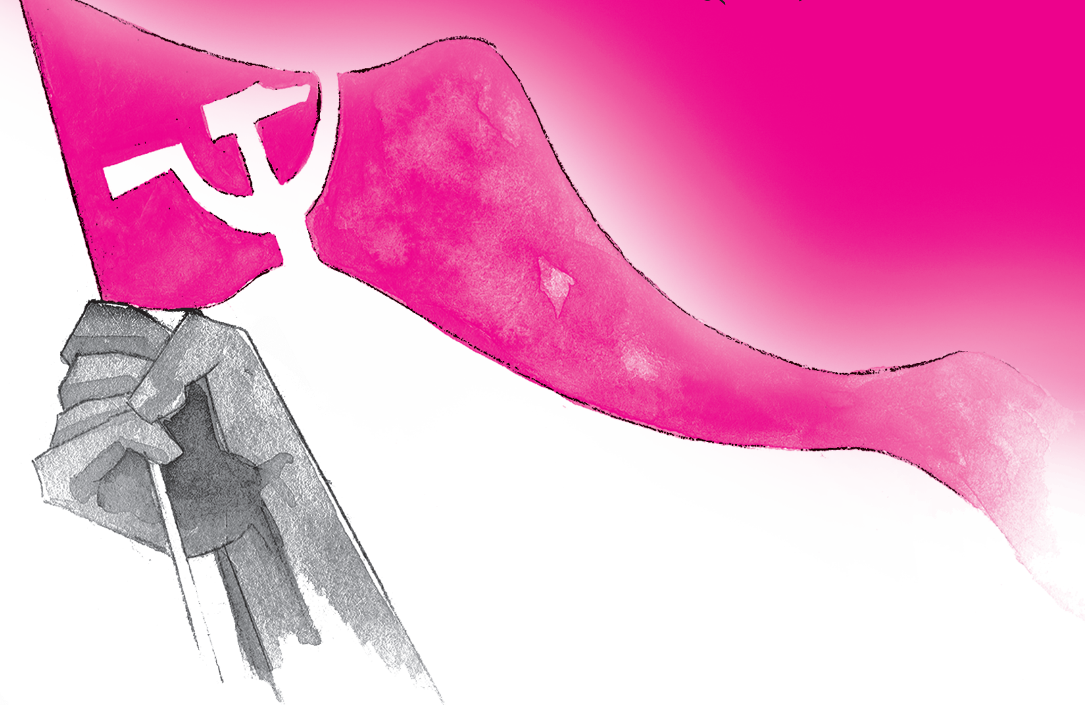

প্রমোদ দাশগুপ্ত শিক্ষা কেন্দ্র

নির্মল–মীরা ভবন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল
জুলাই - ২০১৫

৬টি বিষয়ের ক্লাস নোট

প্রমোদ দাশগুপ্ত শিক্ষা কেন্দ্র
নির্মল–মীরা ভবন

এন বি এ

প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১৭
তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

প্রকাশক :
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড
১২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক
জয়ন্ত শীল
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

প্রচ্ছদ : মনীষ দেব

দাম : ৩০ টাকা

সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকলকেই মতাদর্শ ও রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে হয়। অন্যথায় চলমান ঘটনাবলী, এমনকি তাৎক্ষণিক ঘটনাক্রমকেও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা যায় না। সংগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রতিদিনের লড়াইয়েও শক্তি যোগায়। গড়ে তোলে বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনৈতিক শিক্ষা তাই কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে একটি আবশ্যিক কাজ।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার মান আরো উন্নত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাস, হিংসাত্মক আক্রমণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রুটি রুজির লড়াইয়ের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে এই প্রক্রিয়া চলছে।

পার্টির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে স্থায়ী পার্টি স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে। নির্মল-মীরা ভবনে প্রমোদ দাশগুপ্ত শিক্ষাকেন্দ্রে ধারাবাহিক শিক্ষা শিবির করা হচ্ছে। ২০১৫-র জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুলে ছ'টি বিষয় সম্পর্কে ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি-সহ পার্টির নেতৃবৃন্দ এই ক্লাসে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই ছ'টি বিষয়ে শিক্ষকদের দেওয়া নোট সংকলন করে প্রকাশ করা হলো। এই নোটের ভিত্তিতে বিশদতর পাঠ ও আলোচনা পার্টিকর্মীদের সমৃদ্ধ করবে। সাহায্য করবে আত্মশিক্ষায়।

নভেম্বর, ২০১৫

প্রমোদ দাশগুপ্ত শিক্ষাকেন্দ্র
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

বিষয়

১।	সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আমাদের দায়িত্ব	৭
২।	দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ	১৬
৩।	ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি	২৭
৪।	পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠন	৩৩
৫।	পার্টি কর্মসূচি	৫১
৬।	ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারা	৬৮

সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ, পদ্ধতি, কার্যক্রমের কায়দা

সীতারাম ইয়েচুরি

গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেউ ছিলেন না, এ কথা সত্য নয়। বাস্তবতা হলো হিন্দুত্বের ধারণা তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গাঙ্গী অংশ ছিলো। সাভারকারের পরে হিন্দুত্বের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বি এস মুঞ্জে। আর এস এস প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিলো। মুঞ্জের বাড়িতেই আর এস এস-র প্রতিষ্ঠাতা হেগড়েওয়ার থাকতেন। মুঞ্জে ইতালিতে গিয়েছিলেন, মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এখন তাঁর ডায়েরিও পাওয়া যায়। মুঞ্জে দেখেছিলেন কীভাবে ইতালিতে ফ্যাসিস্ত ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন ঠিক এইভাবেই ভারতে হিন্দুত্ব ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তিনিই পুনেতে ভোনসালা মিলিটারি আকাদেমি শুরু করেন। এই আকাদেমি থেকেই অসীমানন্দ, সাধ্বী প্রজ্ঞা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। মোদী সরকার সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের মতো হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলি নিয়ে তদন্ত শ্লথ করছে।

একটা কথা বোঝা দরকার যে হিন্দুত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক কর্মসূচী। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই রাজনৈতিক কর্মসূচীর কথা ভেবেছিলেন সাভারকার, মুঞ্জে তাকে আরো স্পষ্ট করেছিলেন এবং হেগড়েওয়ার পরিশেষে ১৯২৫-এ আর এস এস তৈরি করে তাকে রূপায়ণের পথে এগোন।

আর এস এস-র মতাদর্শ সাভারকারের চিন্তার ভিত্তিতেই তৈরি। জিন্নারও দু'বছর আগে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে সাভারকার দ্বিজাতি তত্ত্ব সামনে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতে দুই জাতি আছে—একটি হিন্দু ও আরেকটি ঐস্লামিক। শুধু দ্বিজাতিত্ত্বেই তারা বিশ্বাস করতো তা নয়, তারা মনে করত ঐস্লামিক জাতির হাত থেকে হিন্দু জাতিকে মুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যেই আর এস এস প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনও পর্যন্ত

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোই আর এস এস-র মুখ্য কাজ ছিলো। ১৯৩৯-র আগে 'হিন্দু রাষ্ট্রের' ধারণা নির্দিষ্ট ভাবে তৈরি হয়। ১৯৩৯-এ আর এস এস-র তদানীন্তন প্রধান এম এস গোলওয়ালকার একটি পুস্তিকা লেখেন। তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বরাজের ধারণা মূল বিষয়। মহাত্মা গান্ধী বলার ন'বছর আগে ১৯২১ সালে কমিউনিস্টরাই প্রথম স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। মৌলানা হাসরাত মোহানি ও স্বামী কুমারানন্দ এই প্রশ্নে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এ আই সি সি ১৯৩০-এ এই দাবি তোলে। স্বরাজের ধারণার চারপাশেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আবর্তিত হচ্ছিল। কিন্তু আর এস এস কখনোই ব্রিটিশদের তাদের মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেনি। তাদের মূল শত্রু ছিলো মুসলিমরাই, মূল লক্ষ্য ছিলো হিন্দু রাষ্ট্র গঠন। এই প্রেক্ষাপটেই আর এস এস-র প্রধান স্বরাজের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড' ছিলো পুস্তিকাটির নাম। ভবিষ্যতের ভারত সম্পর্কে সঙ্ঘের ধারণার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সেই পুস্তিকায়। আর এস এস-র হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণায় বলা হয় ভারত বরাবরই হিন্দুদের ভূমি, অন্য সব ধর্মের মানুষ এই হিন্দু রাষ্ট্রে থাকতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে। নাগরিক অধিকার থাকবে না তাদের। যতদিন তারা হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের না মেলাতে পারবে তারা নাগরিকত্বও পাবে না। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের যদি থাকতে হয় হিন্দুদের আধিপত্য মেনেই থাকতে হবে। কীভাবে এই হিন্দু রাষ্ট্র গঠিত হবে? ওই পুস্তিকায় মতাদর্শগত ভাবে এবং রণনীতির দিক থেকে যা বলা আছে তা আজ যা বাস্তবে ঘটছে তার থেকে তেমন পৃথক নয়। মতাদর্শ হলো ধর্মীয় অনুভূতিকে অপব্যবহার করো, হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলো এবং পরিশেষে রাজনীতির ওপরে ধর্মের প্রধান্য তৈরি করো। তাদের মতানুসারে, রাজনীতি ধর্মেরই সম্প্রসারণ। স্বাধীনতার সংগ্রামের ধারার পুরো বিপরীত এই ধারণা। সেই সংগ্রামে সব ধর্মের মানুষই অংশ নিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ ছিলো ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এস এস এই ধারণাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি হলো দেশের মধ্যেই কিন্তু হিন্দু সমাজের বাইরে শত্রু চিহ্নিত করা। সেই অংশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় হিন্দুদের ঐক্য সংহত করার চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যসাধনে আর এস এস গণ ফ্রন্ট ও গণ সংগঠন তৈরি করে। ১৯৬০-র দশকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তৈরি হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী সঙ্ঘের গণসংগঠনের সঙ্গে কয়েক কোটি মানুষ জড়িত। এই লক্ষ্য সাধনে ইতিহাসকে বিকৃত করা পূর্বশর্ত। শৈশব থেকেই সাম্প্রদায়িক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য, শিক্ষার পৃথক ধারা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে দেশজুড়ে আর এস এস সরস্বতী শিশু মন্দির তৈরি করেছে। ভারতে যে মিলিত সংস্কৃতি আছে, সঙ্ঘের শিক্ষার ধারা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একীভূত হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সব সংস্কৃতির ধারার বিরোধের ভিত্তিতে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে তারা শিক্ষার বিষয় স্থির করে। ফ্যাসিস্তদের পদ্ধতির একেবারে সরাসরি অনুকরণ।

গোয়েবলস হিটলারের সঙ্গে শুরুতে ছিলেন না। নিজেকে তুলে ধরতেই তিনি হিটলারের কাছাকাছি আসেন। একই জিনিস করছেন মোদী। গোয়েবলসের বিখ্যাত

পদ্ধতি ছিলো বড় আকারে মিথ্যা বলো, বারবার বলো, এক সময় তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। রাম অযোধ্যায় জন্মেছিলেন তা কোনোদিনই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়নি, হবেও না। সে কথা উপকথা কিনা, কোন সময়ে অযোধ্যা কেমন ছিলো সেইসব বিবেচনা না করেই রাম অযোধ্যায় জন্মেছিলেন বারবার বলতে বলতে শেষে বাবরি মসজিদকেই ধ্বংস করা হলো। ইতিহাসে অনেক হিন্দু রাজাও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছেন। বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে হারিয়েছিলেন ইব্রাহিম লোদীকে। তিনি মুসলিম শাসক ছিলেন। সামন্ততন্ত্রে রাজত্ব প্রসারে ধর্ম কোনো ব্যাপারই ছিলো না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা উপকথা দিয়ে ইতিহাস মুছতে চায়, দর্শনের জায়গায় ধর্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যুক্তির অভাব দর্শন থেকে ধর্মতত্ত্বে টেনে নিয়ে যায়। এই একই পদ্ধতি নিচ্ছে আর এস এস। ইতিহাস বিকৃত করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও মেরুকরণকে জোরদার করছে তারা। সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে তা ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সংঘাত নিয়ে গবেষণা করতে হবে। পাঁচ হাজার বছর ধরে এই যুদ্ধ চলছে। প্রথম দু'হাজার বছর লিখিত ভাষায় হয়নি, পরের তিন হাজার বছরের সংগ্রাম লিখিত ভাবেই রয়েছে। এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাব সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করে। কেননা ইতিহাস বিকৃত করা সহজতর হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২০-র দশকের ঘটনাবলীকে বুঝতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২০সালে। প্রথম কমিউনিস্ট কনভেনশন হয়েছিল ১৯২৫সালে। আর এস এস তৈরি হয় ১৯২৫-এই। ১৯২১-এ পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৯২৮-এ কংগ্রেসের মোতিলাল নেহরু কমিটি গঠিত হয় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের লক্ষ্যে। ওই দশকেই গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন। যে যুবকদের মোহমুক্তি ঘটছিল তারা বিকল্পের দিকে তাকাচ্ছিলেন। একদিকে ভগৎ সিং, অন্যদিকে রামমূর্তি, ই এম এস, বাংলায় যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি। ওই অভিমুখ থেকে বামপন্থী মতাদর্শের বিকাশ হয়। ভারতীয় জনগণের আন্দোলনের অমৃতমন্থন হচ্ছিল ওই দশকে।

স্বাধীন ভারতের চরিত্র কী হবে, তা নিয়ে তিন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ওই সময়ে। একটি হলো মূলস্রোতের দৃষ্টিভঙ্গি বা কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি। সেই ধারণায় বলা হচ্ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে, ভবিষ্যৎ ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত না করলে তা সম্ভব নয়। বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তির ধারণার প্রশ্নে একমত ছিলো কিন্তু সেইসঙ্গেই বলেছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পেলে তা টিকবে না। জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রেই। ভারতের ভবিষ্যৎ তাই শুধু ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিকই হবে না, সমাজতান্ত্রিক ভারত হতে হবে। এই ধারণাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে ভগৎ সিং স্বাধীনতার স্লোগানকে বন্দে মাতরম থেকে ইনকিলাব জিন্দাবাদে উত্তীর্ণ করলেন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগৎ সিং-এর অবদান। পাঞ্জাবের ভগৎ সিং ও বাংলার বটুকেশ্বর দত্ত নয়াদিল্লির সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বোমা নিক্ষেপ করলেন। সেই বোমা মামলার শুনানিতে তাঁরা ইনকিলাব

জিন্দাবাদ স্লোগান তুললেন, যার অর্থ হলো বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। সেই বিপ্লবের অর্থ কী, জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বিপ্লবের সরল ও প্রেরণাদায়ী বিবরণ দিলেন। মার্কসবাদের বর্ধিত প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। ভবিষ্যৎ ভারত সম্পর্কে তাঁদের ধারণার সঙ্গে তা মিলেছিল। সমাজতন্ত্রের ধারণা জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাবিত করেছিল। ই এম এস লিখেছিলেন তাঁদের প্রজন্মে সমাজতন্ত্র কথাটি চালু করেছিলেন নেহরু, সুভাষচন্দ্র। ওই দুই ধারণার বিরুদ্ধে তৃতীয় একটি ধারণাও ছিলো যার দুই যমজ প্রকাশ ঘটেছিল। সেই ধারণার ভিত্তি ছিলো ভবিষ্যতের ভারত হবে ধর্মীয় ভিত্তিতে। সেই কারণেই হিন্দু রাষ্ট্র ও ঐস্লামিক রাষ্ট্রের কথা এসেছিল। দুঃখজনকভাবে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে ঐস্লামিক রাষ্ট্র তৈরি হলো। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ ছিলো। সেই কারণেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী আর এস এস-র হাতে নিহত হলেন।

বর্তমান ভারতেও তৃতীয় ওই ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতার চার দশক পরে ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তি রয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক সমতার দিকে, সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার দিকে নীতি প্রবাহিত না হলে সেই ভিত্তি টিঁকবে না। বুর্জোয়া-ভূস্বামী দলগুলি সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসাম্য বাড়িয়েই তুলছে। এর ফলে সকলের ভারতের বদলে হঠে যাওয়া, উন্নয়নের বাইরে চলে যাওয়া অংশের মধ্যে বিছিন্নতাই তৈরি হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তির পক্ষে এই মনোভাবই সবচেয়ে বিপজ্জনক। যত এই মুষ্টিমেয়ের জন্য নীতিনির্ধারণ চলবে, ততো উজ্জ্বল ভারত ও যন্ত্রণার ভারতের মধ্যে পার্থক্য বাড়বে। ধনতান্ত্রিক পথে মুনাফার সর্বোচ্চ বৃদ্ধিই নীতি নির্ধারণের লক্ষ্য। যদি এই মুনাফাবৃদ্ধি হিন্দুত্বের সঙ্গে খাপ খায় তাহলে শ্রেণীস্বার্থে ভারতের শাসকশ্রেণী হিন্দুত্বকেই সমর্থন করবে। কংগ্রেসকে এক সময়ে সমর্থন করত কর্পোরেট মহল, এখন তারাই বি জে পি-কে সমর্থন করছে। জনগণের ওপরে শোষণ তীব্র করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক এজেন্ট চায়। শাসকশ্রেণী রাজনীতিতে নিজেরা সরাসরি ঢোকে না, রাজনৈতিক এজেন্টদের দিয়েই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে যাদের জনসমর্থন লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, সেইসব দলকেই এজেন্ট হিসাবে বেছে নেয় শাসকশ্রেণী। কর্পোরেট বা লগ্নী পুঁজির জন্য কংগ্রেসও এই সময়ে যথেষ্ট করতে পারছিল না। সেই কারণে তাদের সমর্থন বদলে গেছে। নীতি নির্ধারণের সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক থাকুক তা কোনোমতেই চাইবে না এই শক্তিগুলি। ১৯৩০-র দশকে ইউরোপেও একই ঘটনা ঘটেছিল।

১৯২৯সালে বিশ্ব পুঁজিবাদের বৃহত্তম সঙ্কট মহামন্দা হয়েছিল। বিশ্ব পুঁজিবাদ এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কর্পোরেট মহল চাইছিল এমন নীতি অভিমুখ যা তাদের মুনাফাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তখন তারা হিটলারকে খুঁজে পায়। সেই কারণেই বিশ্ব পুঁজিবাদ ১৯৩০-র দশকে খোলাখুলি হিটলারের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল, তাকে মদত দিয়েছিল। হিটলার ও যুদ্ধই ছিলো তাদের সেরা সময়। আজ সাম্রাজ্যবাদ ও লগ্নী পুঁজির কাছে মোদী ডেলিভারি বয়। যদি তিনি সেবা দিতে ব্যর্থ হন তাহলে এই একই শ্রেণী অন্য কাউকে সমর্থন করবে। যারা তাদের স্বার্থ দেখতে পারবে বলে মনে করবে, তাকেই

সমর্থন দেবে। শাসকশ্রেণী এভাবে রাজনৈতিক এজেন্ট বদলাতে থাকে। সে কারণে এখন সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমর্থন পাচ্ছে। নিজেদের আচ্ছে দিনের জন্য আচ্ছে দিনের প্রচারকে তারা সমর্থন করেছেন। জর্জি ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে এই দৃশ্য মিলে যাচ্ছে: ' চরম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে ফ্যাসিবাদ কিন্তু জনগণের কাছে আবির্ভূত হয় এমন এক জাতির চেহারায় যাদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হয়েছে, তথাকথিত অত্যাচারিত জাতীয় ভাবাবেগের কাছে আবেদন তৈরি করে'। ঠিক এই কাজই মোদী করছেন। এই ধরনের রাজনৈতিক এজেন্ট সাম্রাজ্যবাদ-পন্থী হবে। ভারতে এখনকার মতো চমৎকার দিন সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী লগ্নী পুঁজি কখনো পায়নি। বিগত সরকারের কেলেঙ্কারির পরে মোদীকে তুলে ধরার সঙ্গেও ডিমিট্রভের কথা খাপ খায়। তিনি বলেছিলেন, ' ফ্যাসিবাদ জনগণকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিষাক্তদের সামনে ফেলে দেয় কিন্তু এক সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারের দাবি নিয়ে হাজির হয়।' হিটলারের উত্থান সম্পর্কে এ কথা লিখেছিলেন তিনি, মিলে যাচ্ছে মোদীর উত্থানের সঙ্গে। কিন্তু আর এস এস এখন ভারতে যা করছে তাকে ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে তারা ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি ও প্রকরণ প্রয়োগ করছে। সুতরাং আজকের ভারতেও ১৯২০-র দশকের তিন দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ।

সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িকতাই একে অপরের পরিপূরক। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা তীব্র হলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাও জোরদার হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধী শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল করে, কেননা ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী শক্তি সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধী। মধ্য প্রাচ্যের অনেক দেশে বামপন্থী শক্তিকে দুর্বল করতেই ঐস্লামিক মৌলবাদী শক্তিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মদত দিয়েছে। তালিবান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে এখন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের বিরুদ্ধে লড়ছে সাম্রাজ্যবাদ। ভারতেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে জোরদার করছে। ১৯৯৯-র সংসদীয় নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের জামায়েত-ই-তালাবার প্রচার সচিবের একটি সাক্ষাৎকার এক ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তিনি চান বাজপেয়ীই প্রধানমন্ত্রী হোক। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হবার পরে পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর হয়েছে। বাজপেয়ী যত শক্তিশালী হবেন, পাকিস্তানে আমরা ততো শক্তিশালী হব। যোগসূত্র স্পষ্টই।

আজকের পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে জড়িত শক্তি মমতা ব্যানার্জির মদত পাচ্ছে। আর এস এস এবং বি জে পি-র সুবিধা হচ্ছে। হিন্দুদের বি জে পি সাম্প্রদায়িকীকরণ করলে মুসলিম মৌলবাদীরা মুসলিমদের সাম্প্রদায়িকীকরণ করতে সক্ষম হবে। সমস্ত ধরনের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে, ভারতীয় সংবিধানের সাধারণতান্ত্রিক চরিত্রের বিরুদ্ধে। মার্কস সবচেয়ে ভালো উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ধর্মীয় দুর্দশা একই সঙ্গে বাস্তবের দুর্দশারই প্রতিফলন। বাস্তবের দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়, যেমন তা আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। তা

জনগণের কাছে আফিম'। বাস্তবের বিশ্ব থেকে পলায়নের পথ করে দেয় বলেই তা আফিমের মতো শক্তিশালী। অনেক সময়ে মার্কসের উদ্ধৃতির খন্ডাংশ ব্যবহার করায় তিনি যা বলেছিলেন তা বিকৃত হয়ে যায়। জনগণের ওপরে ধর্মের শক্তির কথা স্বীকার করেই মার্কস এমন বলেছিলেন। দ্বান্দ্বিক অংশটি হলো, কল্পিত ও অবাস্তব পৃথিবীতে বাস করো না, পৃথিবীকে পরিবর্তন করো। ধর্ম মানুষকে কী করতে পারে, আজও পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে সার্বিক উপলব্ধি।

কিন্তু আমরা মনে করি ধর্ম বেছে নেবার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে। সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার কারোর নেই। অন্যথায় মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। সাম্প্রদায়িকতা ঠিক তা-ই করে। ধর্মের ব্যক্তিগত পছন্দে তা হস্তক্ষেপ করে। সে কারণে সাম্প্রদায়িকতা গণতন্ত্র-বিরোধীও, কেননা সংখ্যালঘুর ধর্ম বেছে নেবার অধিকারে তা হস্তক্ষেপ করে। মার্কসবাদী হিসাবে আমরা পছন্দের অধিকার স্বীকার করি কিন্তু আমরা বাস্তব পৃথিবীটাকেই বদলে দিতে চাই যাতে এই পছন্দেরই আর প্রয়োজন না পড়ে। আমাদের কাজ পৃথিবীকে পরিবর্তন করা, ধর্মের কল্পজগতকে আক্রমণ করা নয়। আমরা ধর্ম-বিরোধী নই, আমরা মানবাধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরোধী।

আজকের ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বৃহত্তম বিপদ। যদিও অন্য ধরনের মৌলবাদও আছে, তারা পরস্পরের পরিপূরক। সমস্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে কিন্তু সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাই সবচেয়ে বড় বিপদ। গণতন্ত্রের অভাব গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরও সম্ভবনাকে ব্যাহত করবে। সমস্ত ধর্মীয় পরিচিতির সমান অধিকার রক্ষিত না হলে দেশের ঐক্যও রক্ষা করা যাবে না। সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যকেও মানে না। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি বিষ্ণুর দশাবতারের দিকে তাকানো যায় তাহলে চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখা যেতে পারে। প্রথম অবতার মৎস্য। বিজ্ঞান এখন জানিয়েছে প্রথম জীবন তৈরি হয়েছিল জলের ভেতরেই। দ্বিতীয় অবতার কর্ম– জলে-স্থলে বাঁচতে পারে এমন উভচর। তৃতীয় অবতার শূকর– কেবল স্থলে বাঁচতে সক্ষম। জলের ভেতর থেকে স্থল পর্যন্ত জীবনের বিকাশ পর্যন্ত এই স্তর। পরবর্তী হলো নরসিংহ অবতার– পশু থেকে মানুষে রূপান্তরের স্তর। এর পরে বামন অবতার, মানুষের বিকাশ খর্বাকৃতি অবস্থায়। এর পরে কুঠার হাতে পরশুরাম। জনবসতির জন্য অরণ্য পরিষ্কার করার স্তর। এর পরে তীর-ধনুক হাতে রাম, এমন অস্ত্র যা দিয়ে দূর থেকে শত্রুকে আক্রমণ করে বসতি রক্ষা করা যায়। এর পরে বলরাম লাঙল নিয়ে চাষ করছে। মানসভ্যতা কৃষিকাজে উত্তরণ ঘটাচ্ছে। কৃষ্ণ অবতার গোপালন করছে, দুগ্ধ উৎপাদন করছে। দশম অবতার কল্কি অশ্বারোহী, অর্থাৎ ঘোড়াকে গৃহপালিত করা সম্ভব হয়েছে। তা হয়তো অশ্বারোহনে পারদর্শী আর্যদের ধারণা থেকে উৎসারিত। মানব ইতিহাসের এই রূপান্তর উপকথাতেও প্রতিফলিত। কিন্তু উপকথার বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সচেতন ভাবেই আলোচনা থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শেখানো হয় না। ধরা যাক, রাবনায়ণ। তা রামায়ণের মতোই দীর্ঘ, ততোই শ্লোক রয়েছে, ততোই পরিচ্ছেদ রয়েছে। সেই কাহিনীতে ভালো-মন্দ নেই, নায়ক-খলনায়ক নেই, রাবণের কথা। রামায়ণে বলা হচ্ছে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। শিব যখন বর

দিতে চাইলেন রাবণ বললেন তিনি অমরত্ব চান, কোনো মানুষ বা পশু যাতে তাঁকে হত্যা করতে না পারে। শিব বললেন, তথাস্তু। বৃদ্ধ হলে রাবণ মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি চাইলেন। কিন্তু তাঁর জন্য তো তাঁকে মরতে হবে। রাবনায়ণে বলা হয়েছে নারদ এসে বললেন মোক্ষের একমাত্র পথ হচ্ছে দেবতারা যদি তাঁকে মারেন। রামের চেহারায় দেবতা আসবেন। নারদ বুদ্ধি দিলেন এমন কিছু করো যাতে রাম আসে, যুদ্ধ করো, মরে যাও। সেখান থেকেই রামায়ণের কাহিনী শুরু। রাবণ সীতাকে অপহরণ করলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করলেন না। রাবনায়ণের মতে শুধু রামকে লঙ্কা পর্যন্ত টেনে আনতেই তিনি সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। বিভীষণকে পাঠলেন রামকে জানাতে যে ঠিক কোথায় তীর ছুঁড়লে রাবণের মৃত্যু হবে এবং তিনি মোক্ষলাভ করবেন। দক্ষিণ ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় রাবণের মন্দির রয়েছে। তাঁরাও হিন্দুই। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যে এমন বৈচিত্র্য রয়েছে। কে ঠিক করবে যে সঠিক হিন্দু আর কে ভুল হিন্দু? হিন্দু ধর্মীয় ধারায় কোনো একীভূত কাঠামো নেই। চিকাগো ভাষণের শেষ অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছিলেন, সব ধর্মেই এমন মানুষ রয়েছেন যারা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অন্তর থেকে করুণা করি সেইসব লোকদের যারা মনে করে নিজের ধর্মের জন্য অন্যের ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সব ধর্মের পতাকায় খোদাই করে লেখা উচিত: সংমিশ্রণ, ধ্বংস নয়। সেই দর্শন নিয়েই আমরা এগিয়েছি এবং এ পর্যন্ত এসেছি'। সেভাবেই ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন মানবসভ্যতায় সমস্ত মতাদর্শের লড়াই হয়েছে ধর্মের প্রাঙ্গণে। কোপারনিকাস ও পোপ, জ্ঞানদীপ্তির ধারণা ধর্মের অঙ্গনেই ঘটেছে। মানুষের বিকাশের চরিত্রই তাই। ভারতে মতাদর্শগত সংঘাত ধর্মের প্রাঙ্গণে ঘটেছে কেননা তা মতাদর্শের যুদ্ধের স্রষ্টা। ধনতন্ত্র শুরু হবার পরে রাষ্ট্র এবং চার্চের পৃথকত্বের ধারণা এলো, ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা তৈরি হলো। ততদিন পর্যন্ত মতাদর্শের সংঘাত ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমরা বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছি, সব মিলেমিশেই আজ যাকে ভারত বলে চিনি তা তৈরি হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা এই মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচারে ভারতের বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। জানতে হবে কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মের ওপরে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। কেন এত বৌদ্ধ সাংস্কৃতির স্থান ও মন্দির গুহার মধ্যে পাওয়া যাবে? ব্রাহ্মণ্যবাদ বহু স্থানে বৌদ্ধধর্ম পালনের অনুমতি দিত না। বৌদ্ধধর্ম অন্যতম প্রাচীন ধর্ম।। এখন কেউ যদি প্রাচীন ভারত আর হিন্দুধর্মকেই এক করে দেখেন তাহলে ইতিহাসের বদলে উপকথাকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। শূন্যের ধারণা প্রাচীন ভারতের অবদান। কিন্তু গাণিতিক ভাবে অসীম ছাড়া শূন্যের কোনো ধারণা হতে পারে না। অসীমের পূর্ণতা ছাড়া শূন্যতার ধারণা থাকতে পারে না। আবার, শূন্যতার ধারণা ছাড়া পূর্ণতার ধারণাও অসম্ভব। এই হলো বিপরীতের ঐক্যের দ্বান্দ্বিক ধারণা। যখন বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রধান ধর্ম তখন এই ধারণা ভারত থেকে তৈরি হয়েছে। তাদের নীতিতে সহিষ্ণুতা ও সমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি ছিলো। ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনরায় আধিপত্য তৈরি করার পরে এই

জাতীয় আবিষ্কার থেমে যায় কেননা জ্ঞানের সমসুযোগ ছিলো না। ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ তখনই হয়েছে যখন সমান সুযোগের সামাজিক কাঠামো ছিলো, জ্ঞানের বিকাশের পথ রুদ্ধ ছিলো না। ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণ নিপীড়নে সেই অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রশ্ন করতে হবে কেন এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল? মুঘল রাজা ও ভারতীয় রাজারা কেন একসঙ্গে ব্রিটিশদের প্রতিহত করতে পারলো না? ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাতিয়া তোপি একসঙ্গে ১৮৫৭ সালে লালকেল্লায় গিয়ে বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের বাদশাহ ঘোষণা করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য।

আমাদের পার্টি দলিত মুসলিম ও দলিত খ্রীষ্টানদের সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। এমনকি ভারতীয় মুসলিমদের সংস্কৃতিও একীভূত নয়। কেরালার মুসলিমদের সঙ্গে আসামের মুসলিমদের কী অভিন্নতা আছে? মুসলিমদের মধ্যে কত বর্ণ আছে। অন্য সমস্ত ধর্মীয় পরিচিতির মতো তারাও বিভাজিত। ধর্মীয় একীভূত কাঠামো সামনে তুলে ধরে এই বাস্তবতাকে আড়াল করা হয়। সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো সেটিই।

সাম্প্রদায়িকতা তিন ধরনের বিপদ উপস্থিত করে। প্রথমত, ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের কাঠামোর পক্ষে তা বিপদ। আমাদের পার্টির কর্মসূচীগত বোঝাপড়া হলো ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য বদল করতে হবে এবং তার জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে জনগণকে সমবেত করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যক্ষ ভাবে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে। বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ-জাতি নির্বিশেষে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সমানাধিকারের মৌলিক অধিকারকে তা অস্বীকার করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণ তাদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমাদের কাজ হলো সমস্ত সম্প্রদায়ের এমন সমস্ত নিপীড়িত অংশকে একসঙ্গে সমবেত করা। তৃতীয়ত, আমাদের পার্টি কর্মসূচীগত বোঝাপড়া হলো গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে আমাদের বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে তাকে শক্তিশালী করতে হবে। সব স্তরেই নিপীড়িত শ্রেণীগুলির ঐক্যের জন্য আমরা সংগ্রাম করি। সাম্প্রদায়িকতা এই শ্রেণীর ঐক্যকে বিঘ্নিত করে। আমরা চাই ধর্মীয় পরিচিতি নির্বিশেষে ঐক্য, সাম্প্রদায়িকতা চায় ধর্মকে ব্যবহার করে ঐক্যের বিঘ্ন ঘটাতে। সাম্প্রদায়িকতাকে দুর্বল ও পরাস্ত করতে না পারলে আমরা লক্ষ্য পূরণ করতে পারব না। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের লড়াই তাই এই তিন ক্ষেত্রেই প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

আমরা কীভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করতে পারি? প্রথমত, ভারতীয় জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী চেতনা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা হলাম সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ধারায় বিকাশের ফল। ভারতে সব ভারতীয়েরই

একাধিক পরিচিতি আছে, এই প্রাথমিক সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা যখন বিদেশে যাই আমরা ভারতীয়, আমরা যখন দেশে থাকি তখন আমরা কোনো প্রদেশের লোক, ধর্ম-সংস্কৃতি-পছন্দের প্রতিনিধিত্ব করি। এই বহুপরিচিতি কেবল আমাদের শক্তিই নয়, আমাদের বৈচিত্র্যের উপাদান। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অভিন্নতার বন্ধনকে সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট করে না, বরং একীভূত ধারণা চাপিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে ধ্বংস করে। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম চাপিয়ে দেবার অর্থ হলো ভারতের ঐক্যকে বিপর্যস্ত করে ফেলা।

এই যুদ্ধে নিরন্তর মতাদর্শগত সংগ্রাম জরুরী, শক্তিশালী মতাদর্শগত লড়াই জরুরী। ঐতিহ্য থেকেও উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন তিনি ভবিষ্যতের ভারতকে দেখতে চান ঐস্লামিক শরীর ও বেদান্ত মনের মিলনে। দারা শিকো তাঁর বিখ্যাত মাজমা-উল-বাহারিনে সুফীবাদ ও উপনিষদের সমন্বয়ের কথা লিখেছিলেন। দারা শিকো মুসলিম ছিলেন, বিবেকানন্দ হিন্দু সাংস্কৃতিক ধারার প্রতীক। কিন্তু তাঁদের চিন্তা এক জায়গায় মিলেছিল। সাম্প্রদায়িকতা সভ্যতাকে পিছিয়ে দেবে, কমিউনিস্টদের কাজ হলো সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাস্তবে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত কিছুতেই হস্তক্ষেপ করে। পাঠ্যসূচী পরিবর্তন, উপাচার্য নিয়োগ, গবেষণা সংস্থার প্রধান নিয়োগ, এমনকি এখন কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে সরস্বতী খুঁজে বের করতে। ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে, প্রশাসনের সমস্ত অংশকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রে বি জে পি এবং আর এস এস-র নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তি বিপদের মুখে। উপরন্তু তারা দেশের শাসকশ্রেণীর এজেন্ট। ভারতের শাসকশ্রেণী ও লগ্নী পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে তারা সাহায্য করবে। এর অর্থ শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের ওপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ। শ্রম আইনের সংশোধন, জমি আইনের সংশোধন সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত। মোদীর সব বিদেশ সফরে ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে আম্বানি-আদানি সঙ্গী হচ্ছেন। বাংলাদেশকে দেওয়া ২০ কোটি ডলারের সহায়তার প্রায় পুরোটাই আদানি আর আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধান্দার ধনতন্ত্রের সবচেয়ে জঘন্য রূপ দেখা যাচ্ছে। মতাদর্শগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে এরই বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ওদের প্রচারের ফ্যাসিস্তসুলভ পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। 'দি প্রিন্স'—এ মাকিয়াভেলি লিখেছিলেন জনগণকে বলো তুমি কতটা খারাপ করতে পারো, তারপর তা আর কোরো না। তাহলে জনগণ তোমার জয়ধ্বনি করবে। সমর্থন লাভের এমনই পরামর্শ দিয়েছিলেন মাকিয়াভেলি। মোদী কী করতে পারেন তা গুজরাটে দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রে তা করছেন না। আমাদের কাজ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরে আক্রমণের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করা। রাজনৈতিক কোয়ালিশন করে সাম্প্রদায়িকতাকে পুরোপুরি পরাস্ত করা যাবে না, সাময়িক কিছু সুবিধা হতে পারে। মৌলিক লড়াই মতাদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে লড়তে হবে। মতাদর্শগত স্তরে সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে সাংগঠনিকভাবে তাদের পরাস্ত করতে হবে।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

★ মার্কসবাদ- শোষণ মুক্তির মতবাদ

মানবসমাজের বিকাশ ধারার অনুশীলনকে বিজ্ঞানে উন্নীত করার কৃতিত্ব মার্কসবাদের। শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত সমৃদ্ধ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধান দিয়েছে মার্কসবাদ। এটাই মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যৌথভাবে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আজ যেমন আমরা দেখছি মার্কসবাদকে অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ করার লাগাতার প্রয়াস – এটা নতুন কিছু নয়। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এই প্রচেষ্টা চলছে। কার্ল মার্কসের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধে কমরেড লেনিন বলেছিলেন – "সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র বুর্জোয়া বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে মার্কসের মতবাদের প্রতি চূড়ান্ত শত্রুতা ও আক্রোশ দেখা যায়।"

উনিশ শতকে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে যেগুলি বর্ণিত হতো তার অন্যতম ছিল যথাক্রমে জার্মান দর্শন, ইংরেজি অর্থশাস্ত্র ও ফরাসি সমাজবাদ।

এই তিনটি ছিল মার্কসবাদের উৎস। এই সময়ে দর্শনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল জার্মান দর্শনে। একদিকে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও অপরদিকে ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে বস্তুবাদের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল।

আবার, মার্কসবাদের তিনটি উপাদান। তিনটি উপাদান হলো যথাক্রমে মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় অর্থনীতি ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব। মার্কসবাদকে উপলব্ধি করতে হলে মার্কসীয় দর্শনকে জানতে হবে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হলো মার্কসীয় দর্শন। মানবসমাজের বিকাশের অনুসন্ধানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদই হলো মার্কসীয় দর্শন।

★ দর্শন কি?

'দৃশ্' ধাতু থেকে দর্শন শব্দটি এসেছে। দর্শন শব্দের অর্থ দেখা। নিজের চারপাশকে ভালো করে দেখাই হল দর্শন। ইংরাজি 'Philosophy' (ফিলোজোফি) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো দর্শন। এর উৎস হলো দুইটি গ্রীক শব্দ যথাক্রমে 'Philos' (ফিলোস) ও 'Sophia' (সোফিয়া)। এই দুইটি শব্দর অর্থ হলো জ্ঞান ও ভালোবাসা। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা।

নিজের চারপাশকে ভালো করে দেখা – এটা সমস্ত সচেতন মানুষই করেন। দর্শন জড়িয়ে রয়েছে সমস্ত মানুষের জীবনে।

দর্শন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে – যা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। দর্শনের চর্চায় মানুষের মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠায় যারা আশঙ্কিত এটা তারাই করেছেন।

● সমস্ত সচেতন মানুষেরই দর্শন রয়েছে। অধিকাংশেই অচেতন দার্শনিক। মার্কসবাদ চায় সকলকে সচেতন দার্শনিকে পরিণত করতে।

● দর্শনের অন্তর্বস্তু – প্রকৃতি জগত, মানবসমাজ ও চেতনার আন্তঃসম্পর্কই হলো দর্শনের মূল অন্তর্বস্তু।

● দর্শনের বিষয়বস্তু – প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ নিয়ম ও সূত্র রয়েছে। এই সাধারণ নিয়ম ও সূত্রগুলির চর্চাই দর্শনের বিষয়বস্তু গড়ে তোলে।

দর্শন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস– "Every true philosophy is the intellectual quintessence of its time." প্রতিটি প্রকৃত দর্শন হলো সেই যুগের বুদ্ধিগত বিকাশের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অঙ্গ।"

বহু প্রাচীনকাল থেকে মানবসমাজে দর্শনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, চীনের সঙ্গে ভারতেও বহু প্রাচীনকাল থেকে দর্শনের অস্তিত্ব রয়েছে।

● দর্শন কিন্তু শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। হয় শোষক বা শোষিত কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার লক্ষ্য নিয়েই দর্শন অগ্রসর হয়েছে। দর্শন সবসময়ই হলো শ্রেণী দর্শন। হয় শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য, অথবা শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের শক্তিকে উৎসাহিত করে দর্শন।

● আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসাবে মার্কসীয় দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে।

★ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রকৃতি জগত ও তার ঘটনাবলীকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। সাথে সাথে এই দর্শন প্রকৃতি জগত ও তার ঘটনাবলীকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করে। 'Dialego' শব্দটি থেকে 'Dialectical' শব্দটি এসেছে। প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল, চিন্তাধারার অভ্যন্তরের স্ববিরোধগুলি উন্মোচন করা এবং পরস্পরবিরোধী মতের সংঘাতের

মধ্য দিয়েই সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

দ্বান্দ্বিকতার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিক হেগেলের অবদান।

হেগেলের দর্শনের সীমাবদ্ধতা। মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে ভাববাদের থেকে মুক্ত করে তাকে বস্তুবাদের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

★ দর্শনের দুইটি ধারা

দর্শনের দুইটি মূল ধারা। বস্তু ও চেতনার সম্পর্কের প্রশ্নকে ঘিরে দুই ভাগ। বস্তু না চেতনা কোনটা আগে, কোনটা আদি। কোনটা মুখ্য।

বস্তুবাদী দর্শন – বস্তুই আদি, মুখ্য ও সত্য। বস্তুর বিকাশের ধারায় চেতনার উদ্ভব।

ভাববাদী দর্শন – ভাব বা চেতনাই আদি। মুখ্য ও সত্য। চেতনার ইচ্ছা অনুসারেই বস্তু গড়ে উঠেছে।

আর একটি মূল প্রশ্ন, বস্তুকে কি জানা সম্ভব? এক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্য- বিতর্ক।

ভাববাদী দর্শন – প্রকৃতি জগতের সমস্ত কার্যধারাকে অতীন্দ্রিয় শক্তির কার্যধারা হিসাবে বর্ণনা করেছে। ভাববাদী দর্শনকে আশ্রয় করেই ঈশ্বর চিন্তা গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ভাববাদ।

● বস্তুবাদী দর্শন– বস্তুই আদি, মুখ্য ও সত্য এবং বস্তুর বিকাশের স্তরেই চেতনার উদ্ভব, এই হলো বস্তুবাদী দর্শনের মূল বক্তব্য। মানবসভ্যতার বিকাশের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমান্বয়ে বিকাশ ঘটেছে। বস্তুবাদ একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হলো বস্তুবাদ। মানুষের সামাজিক সত্ত্বাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। বস্তুকে আশ্রয় করেই চেতনা গড়ে ওঠে।

বস্তুবাদী দর্শন ঈশ্বর নামক কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব বাতিল করে। বস্তু তার নানারূপে অনাদিকাল ধরে বিরাজ করছে – তাই এর সৃষ্টি বা স্রষ্টার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। সচেতন বস্তু – মানুষ। মানুষের চিন্তা, আবেগ, আদর্শ ও চাহিদাগুলি গড়ে ওঠে জীব হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের ধারায় এবং এই পৃথিবী গ্রহে অন্য জীবগুলির সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। যে কোন সময়ের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই চিন্তা, আবেগ, আদর্শ ও চাহিদাগুলি গড়ে ওঠে।

● বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বিকশিত হয়েছে। বস্তুবাদ পুষ্ট হয়েছে।

● বস্তুবাদের বিবর্তন – এই ধারাতেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আবির্ভাব ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিস্ময়কার অগ্রগতি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বিশেষ করে তিনটি আবিষ্কার–

(১) শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তরের তত্ত্ব।

(২) কোষ বিভাজনের তত্ত্ব।

(৩) ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব।

বস্তুজগতের বিকাশ ধারাকে অনুধাবন করা সম্ভব হলো। বস্তুবাদ সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করলো। বিকাশের সর্বাঙ্গীন সুগভীর মতবাদ হিসাবেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পত্তন ঘটলো।

"বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীনী, সবচেয়ে বিষয় সমৃদ্ধ ও সবচেয়ে সুগভীর তত্ত্ব।" (লেনিন)

"একটি সমগ্রকে খণ্ডিত করা এবং এর পরস্পর বিরোধী অংশকে জানাই হলো দ্বান্দ্বিকতার মর্মবস্তু।" (লেনিন)

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে যখন মানবসমাজের বিকাশ ধারার অনুসন্ধানের নিমিত্তে প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসীয় দর্শন বলতে বোঝায় দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

বস্তুবাদী দর্শন সবসময়ে শোষিতশ্রেণীর দর্শন হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বাধিক শোষিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।

বস্তু বলতে কি বোঝায়? আমাদের চারপাশে যা কিছু সমস্ত কিছুই বস্তু। মানুষসহ জীব ও উদ্ভিদ জগৎ। নদ-নদী, সাগর-পাহাড় আমাদের পৃথিবী, সূর্য, সমগ্র সৌরজগৎ সবই বস্তু, ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী সবই বস্তু। খালি চোখে ধরা পড়ে না – ইলেকট্রন, প্রোটন, পরমাণু সবই বস্তু। শক্তিও বস্তু। ঘটনাবলীও বস্তু।

বস্তু একটি দার্শনিক সংজ্ঞা – যার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, যা আমাদের চেতনা নিরপেক্ষ এবং চেতনায় প্রতিফলিত হতে পারে তাই হলো বস্তু।

★ বস্তু সর্বদাই গতির মধ্যে বিরাজ করছে

বস্তুর অস্তিত্বের রূপ হলো গতি। বস্তু সর্বদাই গতির মধ্যে বিরাজ করছে। স্থির হলো আপেক্ষিক। গতির দ্রুততর হওয়া – বস্তুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। স্থিরতাও গতির একটি রূপ।

★ প্রাণ

বস্তুর বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ হলো প্রাণ। এই পৃথিবীতে জড় পদার্থ থেকেই বিকাশের ধারায় প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রায় ৩৭০ কোটি বছর পূর্বে প্রাণের আবির্ভাব। প্রাণের বিবর্তনের ধারায় মানুষ। প্রায় ২৫ লক্ষ বছর পূর্বে অস্ট্রালোপিথেকাসদের তৈরি পাথরের হাতিয়ারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় ৬০লক্ষ বছর পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম এমন বানর (APES)-দের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যাদের থেকে আধুনিক মানুষের উদ্ভব।

★ চেতনা

মস্তিষ্কের কার্যধারার ফল হলো চেতনা ও চিন্তা। মস্তিষ্ক হলো বস্তুর সর্বাপেক্ষা সংগঠিত ও সর্বোচ্চ রূপ। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জেনেছি কিভাবে মানব মস্তিষ্ক কাজ করে।

বহির্জগতের বাস্তবতা এবং মস্তিষ্কে তার প্রতিফলন – এই আন্তঃসম্পর্কেই মানবচেতনার ভিত্তি। মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে কোনো ধারণা, চিন্তা কিছুই গড়ে উঠতে পারে না।

চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া। বাস্তবকে ভিতি করেই জ্ঞান।

★ দ্বান্দ্বিকতার মূল দিকগুলি

● দ্বন্দ্বতত্ত্ব– বিকাশের তত্ত্ব।

বস্তু সর্বদা গতিশীল। বস্তুছাড়া গতি হয় না। শুধুমাত্র যান্ত্রিক গতি নয়। গতির অর্থ সমস্ত ধরনের ক্রিয়া। গতির ফলেই পরিবর্তন। সমস্ত কিছুই পরিবর্তনের ধারায় বিরাজ করছে। স্থায়ী বা চূড়ান্ত বলে কোনো কিছু নেই। গতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সমস্ত কিছুকে বুঝতে হবে। বিশ্ব হলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ। বিকাশ এবং পতনের– অবসানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে। কোনো কিছুই চিরন্তন নয়। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সমস্ত ঘটনাকে এবং তার বিকাশকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে না দেখতে পারলে গুরুতর ভ্রান্তি ঘটবে।

★ দ্বন্দ্বতত্ত্ব-সার্বিক সম্পর্কের তত্ত্ব

সমস্ত বস্তু ও ঘটনা এবং প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছুকে বিচার করলে তা হবে চরম ভ্রান্তি।

ধূলোকণা ও গ্যাসীয় মেঘ যান্ত্রিক গতির ফলে নিকটবর্তী হয়। উদ্ভব ঘটল তাপ ও চাপ-পদার্থিক গতি। অর্থাৎ যান্ত্রিক গতির ফলে পদার্থিক গতি। শুধুমাত্র পদার্থিক গতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে তার উৎস ও বিকাশকে অনুধাবন করা যাবে না। এভাবেই সৃষ্টি হল পৃথিবী।

রাসায়নিক বিকাশ (জলের মধ্যে) সৃষ্টি করলো প্রাণ। প্রাণের বিবর্তন (জৈবিক গতি তথা বিকাশ) মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করল। বিকাশই বস্তুজগতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। সমগ্র বস্তুজগৎ পরস্পর সম্পর্কও একটি অখণ্ড সমগ্র বটে।

পারস্পরিক সম্পর্ক একমুখী নয়, বহুমুখী।

★ বিকাশের মূল নিয়ম

দ্বান্দ্বিকতা সমস্ত কিছুকে বিকাশের মধ্যে দেখে। কোনোকিছুই স্থির নয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে অতি বৃহৎ বস্তু সমস্ত কিছুই বিকাশের ধারায় বিরাজ করছে। যে গতির ফলে পরিবর্তন এবং বিকাশ, সেই গতি কোথা থেকে আসে বা সৃষ্টি হয়? বিকাশের ধারা কিভাবে

পরিচালিত হয়? বিকাশের অভিমুখ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই বিকাশের নিয়মগুলির দ্বারা। তিনটি মূল নিয়ম।

বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম- সমগ্র বস্তু ও ঘটনার মধ্যে বৈপরীত্য বিরাজ করছে। এই বৈপরীত্যের সংঘাত থেকেই গতির সৃষ্টি হয়। বিপরীতের এই সংঘাতকেই বলে দ্বন্দ্ব (Contradiction)। ঐক্য সাময়িক।

ধনাত্মক – ঋণাত্মক
পজিট্রন – ইলেকট্রন
বিশ্লেষণ – সংশ্লেষণ
যোগ – বিয়োগ
শোষিত – শোষক
পুঁজিপতি – শ্রমিক
জমিদার – কৃষক
দ্বন্দ্বের নানা রূপ–

- অপ্রধান ও প্রধান দ্বন্দ্ব
- মুখ্য ও কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব
- বৈরী ও অবৈরী
- বহিস্থ ও অন্তস্থদ্বন্দ্ব

● পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটে পরিবর্তনের ধারা প্রথমে হয় পরিমাণের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। পরিমাণগত পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছলে গুণগত রূপান্তর হয়। পরিবর্তন দ্রুত। গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বস্তু ও ঘটনা নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

জল থেকে বাষ্প, জল থেকে বরফ।

গ্যাসীয় অবস্থা – তরল অবস্থা – কঠিন অবস্থা।

সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদ হলো গুণগত রূপান্তর। শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ-আন্দোলন-পরিমাণগত পরিবর্তন-এর বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের গুণগত পরিবর্তন।

পূর্বেকার পর্যায়ের যা কিছু ইতিবাচক বিকাশশীল, প্রগতিশীল সেগুলি গুণগত নতুন পর্যায়ে সংরক্ষিত হবে।

● নেতির নেতিকরণের মধ্য দিয়ে বিকাশ

নিরন্তর নেতির মধ্য দিয়েই বিকাশের ধারা অগ্রসর হচ্ছে।

নেতির নেতিকরণ প্রকৃতি জগতে।

নেতির নেতিকরণ মানবসমাজে।

বিকাশের ধারা সরলরেখা নয়। সর্পিল আকারে।

নেতির নেতিকরণের অর্থ হলো–

(১) বিকাশের ধারাবাহিকতা;

(২) বিকাশ প্রগতির দিকে;

(৩) চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি হয় তবে উন্নতর স্তরে।

★ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতিগুলির প্রয়োগ মানব ইতিহাসের অনুসন্ধানের নিমিত্তে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু হলো সমাজ বিকাশের নিয়মগুলিকে জানা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুশীলন করা হয় উপলব্ধির স্বচ্ছতার জন্য।

সমাজবিজ্ঞানের নিয়মগুলির ক্ষেত্রে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করল যে, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও চালিকাশক্তির সন্ধান করতে হবে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে। রাষ্ট্র, চেতনা, ধর্ম, দর্শন, মূল্যবোধ এই সমস্ত কিছুর উৎসমূলে উৎপাদন পদ্ধতি।

★ বস্তুজগতের নিয়মগুলি সামাজিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে

বস্তু বা ঘটনা বস্তুজগতের নিয়মের অধীন। এই নিয়ম আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।

সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে সমাজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়–

(১) সমাজের কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। প্রত্যেকটি ঘটনা অপর ঘটনার ওপর নির্ভরশীল ও পরস্পর সম্পর্কিত। উপযোগী সময় দেখা দিলেই সমাজে কোনো ঘটনা ঘটে। কোনো ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে চলবে না।

(২) সমাজে কোনো একটি ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা জনগণের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই পরবর্তী ঘটনার পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করতে থাকে এবং পরবর্তী ঘটনাকে ঘটায়।

(৩) ঘটনাসমূহের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনো ঘটে না।

★ সমাজের বিকাশে জনগণের ভূমিকা

মানবসমাজের প্রতিটি সদস্যই চেতনাবিশিষ্ট। তারা সঙ্কল্প নিয়ে বা আবেগ বশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল। কিছু লক্ষ্য সামনে রেখে মানুষ কাজ করে, প্রায়ই তার ফলাফল দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্যরকম, অথবা যা সে চায় না। সমাজবিকাশের নিয়মগুলিকে অস্বীকার করে কোনো কিছুই ঘটে না। সমাজবিকাশে মানুষের সচেতন কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা এখানেই।

★ সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো চাবিকাঠি

ইতিহাসের নিয়মগুলিকে বুঝতে গেলে প্রত্যেককে সমাজজীবনের সেই দিকগুলিকে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে হবে যেগুলি সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ইতিহাসের সব পর্যায়েই প্রযোজ্য। মানুষের পুনরুৎপাদন এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সামাজিক উৎপাদন উভয়ই হলো মানুষের কাজ যা সর্বযুগেই মানুষের সমাজে প্রত্যক্ষ করা গেছে। পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া যেহেতু জৈবিক সেহেতু এটা নির্ধারক নয়। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক উৎপাদনের বিশ্লেষণ থেকেই ইতিহাসের মূল নিয়মগুলি জানা যেতে পারে। ‘‘সুতরাং প্রাণ ধারণের আশু উপকরণের উৎপাদন এবং যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হলো সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। আইনের ধ্যান ধারণা, শিল্পকলা এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত।’’ (এঙ্গেলস)

নিজের প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করে ও তাকে রূপান্তরিত করে। একেই বলে উৎপাদন। সামাজিকভাবে উৎপাদন। সামাজিক উৎপাদন। হাতিয়ার এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত। হাতিয়ারকে ব্যবহার করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শ্রমের প্রয়োগে সফল হয়েছে। শ্রম ও তার প্রয়োগ এবং হাতিয়ারের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকশিত হয়েছে। উন্নত হয়েছে মস্তিষ্ক। উদ্ভাবিত হয়েছে বাক্‌যন্ত্র।

সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(১) মানবশ্রম; (২) প্রকৃতি (জমি, কাঁচামাল প্রভৃতি); (৩) উৎপাদনের উপকরণ (হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, শক্তি প্রভৃতি) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানও শ্রমের উপকরণ। এগুলি সবই উৎপাদিকা শক্তির অন্তর্গত।

সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। উৎপাদনের উপকরণকে ঘিরে যে সম্পর্ক সেইগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এইগুলিকে বলে উৎপাদন সম্পর্ক।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক যৌথভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে।

বাস্তব জীবনই সমাজের ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলে।

মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চলে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের ধারণা এবং জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে।

বাস্তবজীবনকে ভিত্তি করে যেমন ধারণা গড়ে ওঠে ও তার বিকাশ ঘটে, একবার ধারণা গড়ে ওঠার পর তা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়। সমাজের বিকাশ ধারাকে এই ধারণা বা চেতনা প্রভাবিত করে।

সমাজবিকাশের ধারায় একসময়ের নতুন চিন্তা পরবর্তী সময়ে পুরানো চিন্তায় পরিণত হয়।

প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা

প্রগতিশীল চিন্তা

এই দুই চিন্তার সংঘাত সব সময়েই বিদ্যমান। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে এই চিন্তা জগতের সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। নচেৎ বিপ্লবী সংগ্রাম অগ্রসর হবে না।

★ শোষণ

★ শোষণকে ভিত্তি করেই সমাজে দেখা দিয়েছে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম

উৎপাদনে উপকরণের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণী গড়ে ওঠে।

অন্যান্য সমস্ত পরিচয়ের গুরুত্ব রয়েছে। তবে শ্রেণীপরিচয় হলো মৌলিক।

★ রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম

শ্রেণীসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো শোষক শ্রেণীর চিন্তা, ধারণা এবং তত্ত্বের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম।

আবার শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে বিপ্লবী সংগ্রাম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয় না। এই লড়াই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিচালিত হয়। কারণ যে কোনো বিপ্লবের প্রধান বিষয় হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন।

শ্রেণীসংগ্রাম সবসময়ই অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।

ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়ম—উপলব্ধি ও প্রয়োগ—অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

★ উৎপাদন ব্যবস্থা

উৎপাদিকা শক্তি ও সেইসাথে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক উৎপানের চরিত্রের ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাঠামোকে উৎপাদন ব্যবস্থা বলে। একেই বলে সমাজের ভিত্তি বা কাঠামো। মানবসমাজের বিকাশধারাকে বুঝতে হলে এই ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে হবে। সমাজজীবনের অন্য সমস্ত দিকগুলি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, মতাদর্শ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক রীতি এবং মূল্যবোধ এই সমস্ত কিছু অর্থনৈতিক কাঠামোর থেকে উদ্ভূত। এইগুলিকে উপরিকাঠামো বলে।

★ ভিত্তি ও উপরিকাঠামো

— পারস্পরিক সম্পর্ক — দ্বান্দ্বিক চরিত্রের।

★ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন

ভিত্তি ও উপরিকাঠামো এবং এদের ওপর আরোপিত সমাজজীবন মিলিতভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন সম্ভব করে।

★ মানবসমাজে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন–

(১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ
(২) দাস সমাজ
(৩) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ — শোষণভিত্তিক সমাজ
(৪) পুঁজিবাদী সমাজ
(৫) শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ

★ উৎপাদিকা শক্তি ধারাবাহিকভাবে বর্ধমান

★ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন

★ সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে মৌলিক দ্বন্দ্ব – উৎপাদিকা শক্তি বনাম উৎপাদন সম্পর্ক–শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ।

★ সমাজবিকাশের চালিকা শক্তি শ্রেণীসংগ্রাম

★ রাষ্ট্র ও বিপ্লব

★ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

★ সমাজতান্ত্রিক সমাজ–কয়েকটি কথা

রাজনৈতিক রূপ–সর্বহারার রাষ্ট্র।

★ অর্থনৈতিক রূপ–উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা

সমস্ত কিছুই সমাজের সম্পত্তি। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানা নয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছাড়াও যৌথ সমবায় প্রভৃতি মালিকানাও সামাজিক মালিকানার রূপ হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি। পরিকল্পিত উৎপাদন। মুনাফার জন্য নয়। ‘‘কাজ অনুসারে প্রত্যেকে পাবে’’।

পশ্চাদপদ দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সমাজতন্ত্র যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার থেকে বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর তা ক্রমান্বয়ে প্রমাণিত হচ্ছে। তবে কিছু নেতিবাচক ঘটনাকে আমরা বিবেচনায় রাখি।

বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হবে। ‘‘প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুসারে দিতে হবে।’’

জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটে চলবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে।

গুরুতর কিছু ত্রুটি, ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির ফলেই প্রতিবিপ্লব সফল। জোর করে এই সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে উক্ত দেশগুলিতে গুরুতর সঙ্কট ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাধারণ নিয়মগুলি শুধুমাত্র আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্টভাবে বিচার করতে হবে। সেইজন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ভারতের সমাজবিকাশের ধারাকে অনুশীলন করতে হবে। যা পরবর্তী বিষয় হিসাবে আলোচিত হবে।

ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি : মূল বিষয়গুলির সারসংক্ষেপ

অসীম দাশগুপ্ত

ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় আর্থিক গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করা হবে শ্রেণি সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং আলোচনা হবে কিভাবে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক নীতি গৃহীত হয়েছে শাসকশ্রেণির স্বার্থে। এই আলোচনা শুরু হবে স্বাধীনতার পূর্বেকার পরিস্থিতি উল্লেখ করে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে। তারপর বিশ্লেষণ করা হবে স্বাধীনতার পর আর্থিক গতি-প্রকৃতির, এবং নির্দিষ্ট সময়কালে ভাগ করে। বিশেষভাবে আলোচিত হবে আর্থিক বৈষম্যের বিষয়টি, এবং তার নেতিবাচক প্রভাব। এরপর দেখানো হবে কিভাবে উদারনীতি গৃহীত হল, এবং তারপর দেশের আর্থিক গতি-প্রকৃতি কোন দিকে মোড় নিল, এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে কোন নতুন বিপজ্জনক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে কি বিকল্প নীতি সম্ভব, এবং অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এ-রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা, সংক্ষেপে আলোচিত হবে শেষাংশে।

১। **পরিপ্রেক্ষিত :** স্বাধীনতার পূর্বেই স্বাধীনোত্তর ভারতের অর্থনীতি কোন পথে এগোবে, তার উপরে ছিল দু'টি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী। একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা হয়েছিল, দেশের অর্থনীতির বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের কল্যাণকর ভূমিকা থাকবে। আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গীতে জোর দেওয়া হয়েছিল বাজার-নির্ভরতার উপর। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথ। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত ছিল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, প্রয়োজনে

আপস করে, ক্ষমতা হস্তান্তরের চিন্তা। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে ছিলেন তখনকার জাতীয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ছিল বামপন্থীদের।

২। **রাজনৈতিক ঘটনাবলী :** স্বাধীনতার ঠিক আগে রাজনৈতিক ঘটনাবলী দু'দিকে প্রবাহিত হয়। একদিকে গণ আন্দোলনের (বিশেষ করে, তেভাগা আন্দোলন, ডাক বিভাগের কর্মীদের দেশব্যাপী ধর্মঘট ইত্যাদির) ভিত্তিতে এবং ভারতের নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও স্থল বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের মাধ্যমে আপসহীন সংগ্রামের ধারাটি পৌঁছে যায় আরো ব্যাপক স্তরে। অন্য দিকে, যাতে এই ধারাটির অগ্রগতিকে বিনষ্ট করা যায়, তার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের মদতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়, এবং তার সুযোগ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্বার্থান্বেষী মহল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস করে, দেশভাগের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা মেনে নেয় এক খণ্ডিত ভারতবর্ষের।

৩। **স্বাধীনতার পর আর্থিক গতি প্রকৃতি :** স্বাধীনতার পরে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যের মধ্যে এক ধরনের আপস করার চেষ্টা হয়, এবং ফলে দেখা দেয় আর্থিক গতি-প্রকৃতির মধ্যেও স্ববিরোধ। একদিকে, শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজি এবং কৃষির ক্ষেত্রে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে মেনে নেওয়া হয়। অন্যদিকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে মৌলিক শিল্পগুলিকে (সেই সময় বেসরকারি সংস্থাগুলি যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না), বিশেষ করে লোহা, ইস্পাত, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। একই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যগুলির মালিকানা রাখা হয় বেসরকারি হাতে, এবং লাইসেন্স নীতির মাধ্যমে কার্যত বৃদ্ধি পেতে থাকে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর একচেটিয়া ক্ষমতা। একচেটিয়াত্ব অনুসন্ধান কমিটির (১৯৭০-৭১) রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭০-এর দশকেই মাত্র ২০টি একচেটিয়া বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী সমগ্র দেশের শিল্পপুঁজির মালিকানার ৩৩ শতাংশ দখল করে নেয়, এবং পরবর্তী সময়ে এই একচেটিয়াত্ব আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মৌলিক শিল্পগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে, উৎপাদনের উপকরণের যোগান অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে।

অনুরূপভাবে, সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলের জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকদের সঙ্গে আপস করে ভূমিসংস্কারের বিষয়টি, সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে স্থগিত রাখা হয়। তার ফলে, বৃহৎ সেচের ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তার সুবিধা চলে যায় গ্রামাঞ্চলের উপরের ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে। কিন্তু সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক, বর্গাদার এবং খেতমজুরদের (গ্রামাঞ্চলে নিচের ৯০ শতাংশ পরিবারের) ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং ১৯৭৬-৭৭ সালেও গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত থাকে ৫০ শতাংশেরও বেশি।

এই আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবহেলিত হতে থাকে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলিও। জাতীয় স্তরে বিভিন্ন কমিশন গঠন করে এই ক্ষেত্রগুলিতে আর্থিক বরাদ্দ

বৃদ্ধির কথা বলা হলেও, কার্যত পদক্ষেপগুলি হয় ব্যর্থ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে মানব উন্নয়নসূচকের নিরিখে ভারতের স্থান হয় একেবারে নিচের দিকে। সামাজিক ক্ষেত্রে এই অবহেলার কারণেও বৃদ্ধি পায় আর্থিক বৈষম্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃহৎ পুঁজি এবং জমিদার-জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ।

৪। **আর্থিক বৈষম্যের প্রভাব :** আর্থিক বৈষম্যের প্রভাবে ব্যাপক অংশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশও হয় ক্ষতিগ্রস্ত। দেশের বাজারের ক্ষতি হওয়া এবং একই সঙ্গে শিল্পের মালিকানায় একচেটিয়াত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পের সামগ্রিক বিকাশে নেমে আসে শ্লথতা। অন্যদিকে, আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবিত্ত শ্রেণির তরফ থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে বিলাস পণ্যের সরাসরি আমদানি, এবং এই শ্রেণির ব্যবহারের প্রয়োজনেই পরিবহনের ক্ষেত্রে পেট্রোপণ্যের অতিরিক্ত আমদানি। কিন্তু অপরদিকে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্লথতার ফলে রপ্তানির যথেষ্ট বৃদ্ধি না হওয়ায় আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ব্যবধান, অর্থাৎ বৈদেশিক ব্যাণিজ্যে ঘাটতি, ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তা বিপজ্জনক স্থানেই চলে যায়। এর প্রেক্ষিতে, দেশের মধ্যেই নীতির পরিবর্তন (স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি, বিলাসপণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) না করে, প্রথমে ১৯৮০ সালে এবং তারপরে ১৯৯১ সালে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং সংসদে প্রয়োজনীয় আলোচনা না করেই, এই ঋণের শর্তাবলীর মাধ্যমে সহজেই মেনে নেয় তথাকথিত উদারনীতি।

৫। **উদারনীতির পর দেশের আর্থিক গতি-প্রকৃতি :** উদারনীতিতে বলতে শুরু করা হয় যে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয়গুলি ছেড়ে দেওয়া উচিত বাজার ব্যবস্থার উপর, এবং খর্ব করা উচিত সরকারের কল্যাণকর ভূমিকার। যেহেতু বাজারকে পরিচালনা করে যাদের সর্বাপেক্ষা আর্থিক ক্ষমতা তারাই, তাই এই নীতিতে বলা হয়, সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থার দায়িত্ব ক্রমেই ছেড়ে দিতে হবে দেশের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীদের হাতে এবং তারপর আরো শক্তিশালী বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে, এবং মেনে নিতে হবে তাদের সর্বোচ্চ লাভ করার প্রবণতাকে।

এই উদারনীতির কারণেই দ্রুততার সঙ্গে হ্রাস করানো হয় আমদানি শুল্ক এবং পরিমাণগত সমস্ত বাধা। ফলে বিদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকে আরো ব্যাপকভাবে। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বের ধনী দেশগুলি আমাদের দেশ থেকে রপ্তানির জন্য খোলেনি তাদের দেশের দরজা। তাই আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যে যে ব্যবধান (যার জন্য সমস্যার শুরু, যা পূর্বে উল্লিখিত), তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯১-৯২ সালে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে যে ব্যবধান ছিল ৩,৮০০ কোটি টাকা, তা আরো ভয়াবহভাবে, প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে, ২০১৩-১৪ সালে পৌঁছায় ৮.২৬ লক্ষ কোটি টাকাতে (উৎস : আর্থিক সমীক্ষা, ভারত সরকার, ২০১৩-১৪)। অর্থাৎ, উদারনীতির ফলে আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রী, বিশেষত শিল্পপণ্য সামগ্রী, তাদের এই বিশাল পরিমাণের বাজার হারিয়েছে, এবং শিল্পে এসেছে রুগ্নতা। ইদানীংকালে, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে আমাদের দেশে শিল্পে বৃদ্ধির হার হয়েছে ঋণাত্মক

(-০.৪ শতাংশ)। এবং এই কারণে শহর ও আধা-শহর অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব।

পুনরায়, এই উদারনীতির ফলে কৃষির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কল্যাণকর ভূমিকাকে খর্ব করেছে। যেখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বাজেটের ২২ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে, এখন তা ২ শতাংশে নেমে এসেছে (উৎস : কেন্দ্রীয় বাজেট, ২০১৪-১৫)। ফলে, সমগ্র দেশে মোট কৃষিজমির মধ্যে সেচসেবিত জমির অনুপাত এখনো রয়ে গেছে ৫০ শতাংশের নিচে। উদারনীতির পথ ধরে ভারত সরকার তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সার কারখানাগুলি (ঝাড়খণ্ডে সিন্ধ্রীর সার কারখানা, এ-রাজ্যে হলদিয়া ও দুর্গাপুরের সার কারখানা ইত্যাদি) বন্ধ করে দিয়ে সারের যোগানের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভরশীল করে দিয়েছে বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপর, এবং তারা সুযোগ বুঝে, তীব্রভাবে বৃদ্ধি করেছে রাসায়নিক সারের দাম। কৃষিতে উৎপাদনের খরচ বেড়েছে, কিন্তু কৃষকরা তাঁদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাননি। ফলে কৃষি উৎপাদনেও এসেছে শ্লথতা এবং গ্রামাঞ্চলেও বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব।

সাধারণ কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পাননি, অথচ বৃহৎ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়াত্বের দাপটে ক্রেতাদের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বেড়েই চলেছে। এটা জানা সত্ত্বেও, পুনরায় উদারনীতির কারণেই, কেন্দ্রীয় সরকার সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে পালটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি প্রশমন করার ক্ষেত্রে নিজেদের কল্যাণকর ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত রেখেছে।

এছাড়া, মৌলিক শিল্পগুলির (লোহা, ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদির) ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার পরিবর্তে শুরু হয়েছে নির্বিচারে বেসরকারিকরণ। এবং সামগ্রিকভাবে, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যেখানে ১৯৮৭-৮৮ সালে দেশের মোট বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ ছিল সরকারি বিনিয়োগ, সেখানে উদারনীতি লাগু হওয়ার পর ২০১১-১২ সালে মোট বিনিয়োগের মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের অংশ ব্যাপকভাবে হ্রাস করিয়ে নামানো হয়েছে ২৪ শতাংশে (ভারত সরকার, আর্থিক সমীক্ষা, ২০১১-১২)।

উদারনীতির এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকাকে করা হয়েছে সঙ্কুচিত, এবং এই সঙ্কুচিত ভূমিকাতেও, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ব্যয়বরাদ্দ করার সময় এবং রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনা সহায়তা বরাদ্দের ক্ষেত্রে, অগ্রাধিকারের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন বারংবার জোর দিয়েছে বাজার-নির্ভরতার উপর। তবে পরিকল্পনা কমিশনের এই সঙ্কুচিত এবং একপেশে পরিসরের মধ্যেও, রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনার সময়, তাদের বক্তব্য কিছুটা হলেও শোনা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, মূলত বামপন্থীদের এবং বামপন্থী রাজ্য সরকারগুলির তথ্য ও যুক্তির চাপে জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা (একশো দিনের কাজের) প্রকল্প, খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং শিশু শিক্ষা অধিকার আইনের বিষয়গুলিতে আংশিকভাবে হলেও সহমত পোষণ করতে বাধ্য হয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। এছাড়া, সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকগুলিও হয়েছে, যেখানে বক্তব্য রেখেছেন বামপন্থী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা।

এছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে বিরোধীতা করেছেন বামপন্থীরা এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা সংগঠিত করেছেন দেশব্যাপী আন্দোলন। ফলে ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ কিছুটা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার (২০০৭-০৮) হাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে কিছুটা রক্ষা করা সাময়িকভাবে হলেও, সম্ভব হয়েছে।

৬। **বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ :** বি জে পি'র নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি এবং পরিকল্পনা রচনার প্রক্রিয়াটিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে আরো ক্ষতিকারক দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। 'সুদিন' আসতে চলেছে বলে ব্যাপক প্রচার হলেও, বাস্তবে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, শুরু হয়েছে জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা (একশো দিনের কাজ) প্রকল্পের পরিসর এবং অর্থবরাদ্দ ছাঁটাই করার প্রক্রিয়া, যার ফলে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের উপরে নেমে আসবে দুর্দিনের এক নির্মম আঘাত। ইতিমধ্যেই দেশের শ্রম আইন সংশোধন করে একটি বৃহৎ অংশের শ্রমিকদের কাজের সময় (একই মজুরিতে) বৃদ্ধি করা, ই এস আই, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি সুবিধা খর্ব করা এবং ন্যূনতম বেতনের বিষয়টি অবহেলা করা ইত্যাদি শ্রমিক-বিরোধী পদক্ষেপগুলিও শুরু হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য সুরক্ষা আইনের ক্ষেত্রে, এই কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে শান্তা কুমারের (পূর্বতন এন ডি এ সরকারের আমলে বি জে পি'র পক্ষ থেকে খাদ্যমন্ত্রীর) নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে সুপারিশ করানো হয়েছে যাতে খাদ্য সুরক্ষার পরিধি আরো হ্রাস করে জনসংখ্যা নিচের মাত্র ৪০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। এছাড়া, শুরু হয়েছে ভারতের খাদ্য নিগমকেই (যার মাধ্যমে গণবন্টন ব্যবস্থা কিছুটা হলেও সমন্বিত হতো) তুলে দেওয়া। বীমা শিল্পের ক্ষেত্রে, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতার ঐতিহ্য জানা সত্ত্বেও, বিদেশি বীমা সংস্থাগুলির বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি করে হয়েছে, এটা ভুলে গিয়ে যে সম্প্রতি এক বিশাল সংখ্যক বিদেশি বীমা সংস্থা তাদের নিজেদের দেশের সঞ্চয়ীদের প্রতারণা করার জন্য কালিমালিপ্ত অবস্থায় আছে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও বিদেশি বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে দেশের নিরাপত্তার এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টি অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে।

জনবিরোধী এই পদক্ষেপগুলি ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করার অঙ্গ হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীরদর্পের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে এখন থেকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনই তুলে দেওয়া হলো। তার পরিবর্তে যে তথাকথিত 'নীতি আয়োগ' স্থাপন করা হলো, তাকে ক্ষমতা দেওয়া হলো কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের। ফলে, কার্যকরীভাবে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলো প্রধানমন্ত্রীর হাতে এবং কিছুটা তার অর্থমন্ত্রীর হাতে। এর ফলে, আর্থিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব মন্ত্রকগুলির মধ্যেই চূড়ান্ত সমস্যা দেখা দেবে। তাই 'নীতি আয়োগ' স্থাপনের পদক্ষেপটি হলো শুধুমাত্র পরিকল্পনা ব্যবস্থার উপরে আঘাত নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের অভ্যন্তরের গণতন্ত্রের উপরেও আঘাত।

এছাড়া, উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার জোর দিচ্ছে

বিদেশি বিনিয়োগের উপর। কিন্তু এখন যে স্বল্প পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে, তার প্রধান অংশটিই হলো বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থপুঁজির (finance capital-এর) বিনিয়োগ। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদেশে কোথাও সুদের হার ঈষৎ বৃদ্ধি পাবে (যার সম্ভাবনা এখন বিশেষ করে দেখা দিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে), তৎক্ষণাৎ বিদেশি বিনিয়োগের এই অর্থ দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে, এবং সৃষ্টি হবে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নতুন ধরনের সঙ্কট। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অঙ্গ হিসেবে এই উদারনীতি আমাদের দেশের আর্থিক সার্বভৌমত্বকে আঘাত করে চলেছে, শুধু তাই নয়, সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থাকেই বিপজ্জনক খাদের কিনারে ঠেলে দিয়েছে।

৭। **বিকল্প আর্থিক নীতি :** আলোচনার এই অংশে, উদারনীতির এই জনবিরোধী এবং সঙ্কটময় পরিণতির কথা প্রতিটি ক্ষেত্রে বারংবার তুলে ধরে বিকল্পনীতির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে। এই বিকল্পনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে উৎপাদনের শক্তিকে বিকশিত করার জন্য যে পদক্ষেপগুলির কথা – পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস করা, ভূমিসংস্কার, সাধারণ কৃষকের স্বার্থে কৃষির উন্নয়ন, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম প্রদান করে প্রয়োজনীয় ভর্তুকির ভিত্তিতে গণবন্টন ব্যবস্থাকে চালু রেখে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির দাম নিয়ন্ত্রণ করা, বুনিয়াদি শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে লাভজনকভাবে চালানো, সংগঠিত এবং অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা, শিক্ষায় ও জনস্বাস্থ্যে বরাদ্দ জাতীয় আয়ের যথাক্রমে ৬ শতাংশ এবং ৫ শতাংশে উন্নীত করা, মহিলা, আদিবাসী, দলিত এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ – ইত্যাদি যে বিষয়গুলি বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে উল্লিখিত আছে, তাকে ভিত্তি করেই এই অংশের বক্তব্য ব্যাখ্যামূলকভাবে রাখা হবে। এরপরে খুব সংক্ষেপে আলোচিত হবে এ-রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা।

পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠন

মৃদুল দে

পার্টি সংগঠনের উৎস, নীতি, তত্ব এবং বাস্তবের মাটিতে তার প্রয়োগ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রত্যেক পার্টি সদস্যের অবশ্যই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বহু রাজনৈতিক দল আছে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে ৪৬৪টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তার মধ্যে জাতীয় দল ৬টি এবং রাজ্যভিত্তিক দল ৫৪টি। রেজিস্টার্ড কিন্তু অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা বর্তমানে ১৬৪৩টি। গত ছয় দশকে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেড়েছে ৩০গুণ। উত্থান-পতন, ভাঙাচোরা, জোড়ালাগা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠিকেন্দ্রিক দলগুলির উদয়াস্ত এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। এই দলগুলির মুখ্য লক্ষ্য যে কোনও ভাবে নির্বাচনে জেতা; কিংবা কখনও কখনও কাউকে জেতাতে বা হারাতে সাহায্য করা। অর্থ, বাহুবল, ঘুষ, পুলিশী শক্তি, কর্পোরেট শক্তি, মিডিয়া, ভেদাভেদ সৃষ্টি, এন জি ও, সন্ত্রাস ও জোচ্চুরি ইত্যাদির ব্যবহার তারা ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে তুলেছে। এ-জন্য এই দলগুলির সাংগঠনিক বাঁধন অত্যন্ত আলগা। সুবিধাবাদের কারণে সুনির্দিষ্ট কোন মতাদর্শে তারা স্থির থাকতে পারে না। এই রাজনৈতিক দলগুলিকে যাচাই করতে হয় তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং শ্রেণী চরিত্র দিয়ে।

যেমন কংগ্রেস বা বিজেপি-র মতো জাতীয় দলগুলি দেশের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশী লগ্নী পুঁজির সঙ্গে ক্রমাগত সহযোগিতায় আবদ্ধ। বর্তমান ভারত রাষ্ট্রও এই বুর্জোয়া এবং বৃহৎ জমির মালিকদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র। বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলগুলি আঞ্চলিক বুর্জোয়া ও গ্রামীণ ধনীচক্রের স্বার্থের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করে। স্বভাবতই কংগ্রেস এবং বিজেপি-র প্রতি মনোভাবের

ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক দলগুলির বেশিরভাগই সুবিধাবাদী রাজনীতি অবলম্বন করে। এমনকি অতীতে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা কিছু দল যারা সমাজবাদের কথা বলে তাদেরও একমাত্র লক্ষ্য নির্বাচনে জেতা এবং শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনের ময়দান থেকে সব সময়ই তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। অন্যান্য দেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে কাজ করে এমন বৃহৎ জাতীয় দলগুলিও শাসকগোষ্ঠী হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের সাংগঠনিক কাঠামোও সেই রূপ পায়।

পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠন

কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের উৎস, নীতি, তত্ত্ব এবং বাস্তবের মাটিতে তার প্রয়োগ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রত্যেক পার্টি সদস্যের অবশ্যই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বহু রাজনৈতিক দল আছে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে ৪৬৪টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তার মধ্যে জাতীয় ৬টি রাজ্যভিত্তিক দল ৫৪টি। রেজিস্টার্ড কিন্তু অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বর্তমানে ১৬৪৩টি। গত ছয় দশকে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেড়েছে ৩০ গুণ। উত্থান-পতন, ভাঙাচোরা, জোড়ালাগা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দলগুলি উদয়াস্ত এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। এই দলগুলির মুখ্য লক্ষ্য যে কোনোভাবে নির্বাচনে জেতা; কিংবা কখন কখন কাউকে জেতাতে বা হারাতে সাহায্য করা। এইজন্য এই দলগুলির সাংগঠনিক বাঁধন অত্যন্ত আলগা। সুবিধাবাদের কারণে সুনির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শে তারা স্থির থাকতে পারে না। এই রাজনৈতিক দলগুলিকে যাচাই করতে হবে তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং শ্রেণী চরিত্র দিয়ে।

পার্টি কর্মসূচীর ৮.৪ ধারায় বলা হয়েছে, "সমস্ত ফ্রন্টে লড়াই পরিচালনা করতে এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গণ-বিপ্লবী পার্টি গঠন করা অপরিহার্য। গণ-আন্দোলন বিকশিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে পার্টির প্রভাব সংহত করে এই পার্টিকে নিরন্তর জনগণের মধ্যে ভিত্তি প্রসারিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার উপর ভিত্তি করে এক শক্তিশালী সুশৃঙ্খল পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীর ও সমস্ত অংশের শ্রমজীবী জনগণের প্রতি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পার্টিকে নিজেকে সবসময় শিক্ষিত ও পুনঃশিক্ষিত করতে হবে, পুনর্নবীকরণ করতে হবে পার্টির মতাদর্শগত-তাত্ত্বিক মান এবং গড়ে তুলতে হবে তার সাংগঠনিক শক্তি।"

দুর্বল জায়গায় পার্টিকে সম্প্রসারণের বিষয়টি ১৯৬৭ সাল থেকেই আলোচিত হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত "পার্টি সংগঠন সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক দলিলে বিকাশের বিভিন্ন ধরনের অসমতার কথা বলা হয়েছে। যেমন, বিভিন্ন রাজ্যে পার্টি সদস্যপদ বৃদ্ধির অসমতা, গণ-আন্দোলনের মাত্রা ও গভীরতায় অসমতা এবং বিভিন্ন রাজ্যে পার্টি সদস্যপদে তার প্রতিফলনে অসমতা, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন অংশের মানুষ, বিভিন্ন ক্ষেত্র ও এলাকাতে পার্টি ও গণফ্রন্টের প্রভাবের অসমতা, গণ-আন্দোলনের চরিত্রের অসমতা যেমন এই আন্দোলনগুলি পুরোপুরি অর্থনৈতিক বা আংশিক শ্রেণী দাবি বা রাজনৈতিক দাবি বা গণতান্ত্রিক দাবি কিংবা অন্যান্য শ্রেনীর সমর্থনে দাবি।

সমগ্র বিষয়টি ১৯৭৮ সালে (২৭-৩১ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত সালকিয়া প্লেনামে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। এই প্লেনামের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, গণ-বিপ্লবী পার্টি গঠন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ভারতীয় বিপ্লবে সফল নেতৃত্ব দিতে পারবে না; সেজন্য পার্টিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণ-বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে তুলতে সদস্যপদের সম্প্রসারণের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত মান ক্রমাগত উন্নত করার কাজে হাত দিতে হবে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে সালকিয়া প্লেনামে গৃহীত কর্তব্য রূপায়নের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৪ বছরে পার্টির বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে ধারাবাহিক কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা এবং নতুন কিছু সমস্যার দিকে প্লেনাম রিপোর্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরবর্তী সময়ের পার্টি কংগ্রেসগুলিতেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টি ও গণফ্রন্টের সম্প্রসারণ ও অসম বিকাশের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

জনগণের এক বৃহৎ অংশ এখনও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের প্রভাবে রয়েছে। আর একটা বিরাট অংশ অসংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ। আবার গত তিন দশকে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক, জাতিগোষ্ঠী এবং অন্যান্য বিভাজনের রাস্তা নিয়ে শাসকশ্রেণীর বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন রকমের আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা বাড়িয়ে চলেছে। এই তিন দশকের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিরাট বিপর্যয় এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া নয়াউদারীকরণের ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’-র পরিণামের বৃহৎ ঘটনা ঘটেছে। ভারতসহ পৃথিবী জুড়ে জনগণের মধ্যে মার্কসবাদ-বিরোধী ও বামপন্থী-বিরোধী ভাবাদর্শগত প্রচার আধুনিক সব মাধ্যম দিয়ে তীব্র আকারে করা হচ্ছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে রাষ্ট্রে, সমাজে এবং সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে। এই সামগ্রিক পরিবর্তনগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা ও যাছাই করে পার্টি ও গণসংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ করা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন এ প্রসঙ্গে বলেছেন : “কোটি কোটি মানুষ পার্টিগুলির উপদেশে কখনই কান দেবে না যদি জীবন থেকে জনগণের অর্জিত শিক্ষার সঙ্গে সেই উপদেশের মিলন না ঘটে”।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি যারা জনগণের পূর্ণ মুক্তির জন্য বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ভ্যানগার্ড হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে লক্ষ্যবদ্ধ।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীই সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী। কারণ এই শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মোকাবিলা করে এবং চ্যালেঞ্জ জানায়। এটিই একমাত্র শ্রেণী যে, শ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে সমাজে মুখ্য ভূমিকা নেয়। শ্রেণীসংগ্রামই বিপ্লবের চালিকা শক্তি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিফলন ঘটে। সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের এই অবিরত ধারায় সচেতন নেতৃত্ব দেওয়াই

কমিউনিস্ট পার্টির মূল কাজ।

১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার রচনা করেন। শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সমিতি কমিউনিস্ট লীগ তখন শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসাবে গোপনে কাজ করছিল। এই লীগের অন্যতম নেতা মার্কস-এঙ্গেলসকে লীগের পক্ষ থেকে পার্টির বিস্তৃত তাত্ত্বিক ও বাস্তব কর্মসূচীর প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এই ইশ্‌তেহারে মার্কস-এঙ্গেলস জার্মানিতে আসন্ন বুর্জোয়া বিপ্লব এবং তা পরবর্তী সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বসূচনা হিসাবে কাজ করবে এই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালে জার্মানি ও ফ্রান্সে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। এর ব্যাখ্যায় মার্কস লিখলেন (ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম : ১৮৪৮-৫০) যে, সে সময় পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি বরং পুঁজিবাদের বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা তখনও বিরাজ করছিল। ইউরোপ জুড়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সংগঠিত করতে মার্কস-এঙ্গেলস একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব একই প্রয়োজন অনুভব করছিল। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৮৬৪ সালে এই সংগঠন জন্মলাভ করে। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব মার্কসের উপর দেওয়া হয়। মার্কস এখানেই উল্লেখ করেন যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে বিজয়ের জন্য সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ করাই এই সংগঠনের মূল কাজ, সর্বহারার মুক্তির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা প্রয়োজন এবং সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজস্ব পার্টি গড়ে তুলতে হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় ও বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় লেনিন লিখেছেন: ''একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলই অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিই পারে সর্বহারার সেই অগ্রণী বাহিনী ও শ্রমজীবী মানুষের সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ, শিক্ষিত ও সংগঠিত করতে। এই অগ্রণী বাহিনী বা ভ্যানগার্ড একাই জনগণের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী পেটি-বুর্জোয়া দোদুল্যমানতাকে সর্বহারাদের মধ্যেকার ট্রেড ইউনিয়নগত সঙ্কীর্ণতার ঐতিহ্য ও তার পুনরাবির্ভাবকে ঠেকাতে পারে এবং সমগ্র সর্বহারাদের সমস্ত যৌথ কার্যাবলীর নেতৃত্ব অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সর্বহারাদের নেতৃত্ব দিতে এবং এর মাধ্যমে শ্রমজীবী সমগ্র জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারে।''

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' এক দলিল গ্রহণ করে যা পৃথিবীর সবদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অনুসরণ করে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় কোনো সাংগঠনিক রূপ হয় না। কারণ শ্রেণীসংগ্রামের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন, তাতে পরিবর্তনও ঘটে। এই বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক রূপের তারতম্য থাকলেও সব ক্ষেত্রে সাধারণ এক ভিত্তি থাকবে। যেমন সাধারণ নীতি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, কর্তব্য, পার্টির পত্রপত্রিকা, রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রচার আন্দোলন, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি।

শ্রেণীচেতনা

স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী শ্রেণীচেতনা অর্জন করতে পারে না। বাইরে থেকে তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা প্রবিষ্ট করাতে হয়। সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে সহজাত একটা শ্রেণীবোধ থাকে। সেজন্য বাইরে থেকে বিপ্লবী তত্ত্ব তাদের মধ্যে এলে তারা সাড়া দেয়। এই বিপ্লবী তত্ত্ব নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সহজাত শ্রেণীবোধকে (class instinct) শ্রেণী চেতনার স্তরে উন্নীত করা। শুধুমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব প্রবিষ্ট করিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে না। মজুরি ও অন্যান্য আর্থিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের মধ্যে যৌথবদ্ধতার গুরুত্ব শ্রমিকরা অনুভব করে। মালিকদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করে। এর থেকে ট্রেড ইউনিয়নগত চেতনা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। এই লড়াইয়ের সময় শ্রমিকশ্রেণী লক্ষ্য করে যে গোটা রাষ্ট্রশক্তি মালিকদের পক্ষাবলম্বন করে। সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সত্য আড়াল করার চেষ্টা করে। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন এই বাস্তব সত্য তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয়। অর্থাৎ কেবল মালিকশ্রেণী বা পুঁজিপতিশ্রেণীই তার শত্রু নয়, রাষ্ট্রও শত্রু, যারা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। 'দর্শনের দৈন্য' বইতে মার্কস আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা লাভের বিষয়টি উল্লেখ করেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক চেতনা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী শ্রেণী চেতনার বিকাশ ঘটায়। এই বিকাশ বা রূপান্তর ঘটানোর জন্যই 'বাইরে থেকে' বিপ্লবী তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে হয়। লেনিন এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'বাইরে থেকে' আসা এই তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই করতে সক্ষম হয়। এই বিপ্লবী শ্রেণী চেতনা থেকে সংগ্রামের বিকাশের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী উপলব্ধি করতে পারে যে গোটা সমাজের মুক্তি না হলে শ্রমিকশ্রেণী কখনোই শোষণ, নিপীড়ন ও মজুরির দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এই চেতনাই সমাজতান্ত্রিক চেতনা। আবার মতাদর্শগত দিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের মতো শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশের রাজনৈতিক দলে শ্রমিকশ্রেণী অগ্রসর নয়। কিন্তু সহজাত শ্রেণীবোধ থেকে মতাদর্শগত বিচ্যুতি বা ভ্রান্ত রাজনৈতিক-মতাদর্শগত লাইন সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণী সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। পুঁজিপতিশ্রেণীই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বধ করার জন্য হাতিয়ার তৈরি করেছে, যে হাতিয়ারের নাম সর্বহারাশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণী। এছাড়া, মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে আরও উল্লেখ করেছেন, শ্রেণী হিসাবে সর্বহারারা নিজেদের সংগঠিত করার জন্য প্রথমতঃ বুর্জোয়ারাই পথ দেখিয়েছে। কারণ সামন্ত প্রভু, জমিদার ও অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে বুর্জোয়ারা সর্বহারাদের রাজনৈতিক সমর্থন চেয়ে পেয়েছিল এবং এভাবে তারা সর্বহারাদের দেয় সাধারণ ও রাজনৈতিক শিক্ষা। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক শিল্পের বিকাশে ছিটকে গিয়ে শাসকশ্রেণী থেকে যারা শ্রমিকদের দলে ভিড়তে বাধ্য হয়েছে, তারাও শ্রমিকদের চেতনার নতুন উপাদান দেয়। আবার বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের একটা অংশ ইতিহাস-বিজ্ঞানের গতিধারা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে মতাদর্শের জগতে সর্বহারাদের পক্ষ নেয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিপ্লবী সংগঠনের

জন্য বিপ্লবী তত্ত্বের অপরিহার্যতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর এই তত্ত্বে চেতনাসমৃদ্ধ করার কথা বলেছেন লেনিন।(এক পা আগে, দু'পা পিছে'–১৯০৪ দ্রষ্টব্য)।

শ্রমিকশ্রেণী শোষিত জনগণের বিভিন্ন অংশের অন্যতম একটি নয়। মার্কসবাদের স্রষ্টারা দেখিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর এক বিশেষ ভূমিকা পালন করার আছে। কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে, ''সমস্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে আজ বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা সর্বহারা শ্রেণীই একমাত্র সত্যিকারের অর্থে এক বিপ্লবী শ্রেণী, আধুনিক শিল্পের সামনে অন্যান্য শ্রেণীগুলির ক্ষয় হয় ও শেষপর্যন্ত বিলোপ হয়; সর্বহারা শ্রেণীই তার (আধুনিক শিল্পের) বিশেষ ও অপরিহার্য ফসল।''

রাশিয়ার অভিজ্ঞতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পুঁজিবাদী বিকাশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। নতুন এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সম্পর্কে মার্কসের ধারণাকে নতুন আরও সমৃদ্ধ করেন লেনিন। পার্টি সংগঠনের নীতিসমূহ তিনি আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং পার্টি সংগঠনের বিষয়গুলিকে একটা বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেন। তখন ভিন্ন ভিন্ন মার্কসবাদী সংগঠনগুলিকে অভিন্ন এক কেন্দ্র এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটাই পার্টির পতাকার নীচে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেনিন অনেক তাত্ত্বিক লেখা উপস্থিত করেন। যার মধ্যে অন্যতম 'জনগণের বন্ধু কারা'। এই তত্ত্ব তাঁর আর একটি লেখায় সমৃদ্ধ হয় 'কী করতে হবে' মার্কসবাদীদের মধ্যেও বিভিন্ন পথাবলম্বীদের নিয়ে একটা রূপরেখা তৈরি করে পার্টি সংগঠনের মূল কর্তব্য নিয়ে তিনি লেখেন 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে?'

সাংগঠনিক নীতির সূত্রায়নে এবং পার্টি সদস্য কারা হবে তার সংজ্ঞা নিয়ে পার্টির মধ্যে তীব্র মতভেদ ও বিতর্ক দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত লেনিনের প্রস্তাবিত নীতিই জয়ী হয়। এই বিতর্কে দুটি ধারার বিভাজন লক্ষ্যণীয় –বিপ্লবী ও সুবিধাবাদী। এটা তখন একদিনে তৈরি হয়নি, কেবল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতেই হয়নি এবং লেনিনের ভাষায় 'কালকেই যে এটা অদৃশ্য হয়ে যাবে, তা-ও নয়'।

সাংগঠনিক প্রশ্নে রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের সুবিধাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করে লেনিন সুবিধাবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছিলেন, ''একজন সুবিধাবাদী তার ধর্ম অনুযায়ীই সবসময় পরিষ্কার ও চূড়ান্ত ভূমিকা নেবার বিষয় সবসময় কৌশলে এড়িয়ে চলে, সে সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করে; পরস্পর স্বতন্ত্র দুটি মতের মাঝখানে সাপের মতো সর্বদা সে এপাশ ওপাশ মোচড় দিয়ে চলে; উভয় মতের সঙ্গে 'সহমত' পোষণের চেষ্টা করে এবং তার মতপার্থক্যকে সে নামিয়ে আনে তুচ্ছ সংশোধনী, সন্দেহ, নিরীহ ও শুনতে-ভালো প্রস্তাবদানের মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি।''

উপসংহার টানেন লেনিন এইভাবে : 'ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর আর কোনো হাতিয়ার নেই...মার্কসবাদের নীতির ওপরে দাঁড়িয়ে মতাদর্শগত ঐক্যের মাধ্যমে এবং সংগঠনের বস্তুগত ঐক্যের দ্বারা মজবুত হয়েই একমাত্র সর্বহারা অনিবার্যভাবে দুর্ভেদ্য

শক্তি হয়ে উঠতে পারে এবং হয়ে উঠবেই''। (সংগৃহীত রচনাবলী খণ্ড-৭)

পার্টি সদস্যদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে বিতর্কে লেনিন যা বর্ণনা করেন সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেই তা প্রচলিত হয় : ''প্রত্যেক পার্টি সদস্য পার্টির প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে এবং পার্টি প্রত্যেক পার্টি সদস্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে.... পার্টির দৃঢ়তা, সঙ্গতি ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।''

কমিউনিস্ট পার্টির অব্যর্থ ও অপরিবর্তনীয় কোন সাংগঠনিক রূপ থাকতে পারে না। বিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। সর্বহারা শ্রেণীর ভ্যানগার্ডের অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনও সবসময় সেই পরিবর্তন অনুসারে সঙ্গতিপূর্ণ রূপ বেছে নিতে অগ্রসর হয়। বৈধ বা অবৈধ, শান্তিপূর্ণ বা সন্ত্রাস-সংকুল বা বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে তাকে কাজ করতে হয়। তবে সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন একটা সাধারণ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি অনুসারে সংগঠনের রূপ নির্ধারণ করে। পরিস্থিতি অনুসারে সাংগঠনিক রূপের যে পরিবর্তনই হোক, তার মূল লক্ষ্য আধিপত্যকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে কার্যকরী লড়াই গড়ে তোলা এবং ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের লক্ষ্যে বর্তমান লড়াই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ এক কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, একমাত্র একটি বিপ্লবী পার্টিই সমস্ত ধরনের বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে। রাশিয়ার বিপ্লবী পার্টি গঠন ও পরিচালনায় লেনিনের শিক্ষা অমূল্য। চীনের বৈশিষ্ট্যে এবং ভিয়েতনামের বৈশিষ্ট্যে লেনিনীয় সাংগঠনিক নীতির প্রয়োগও সমান মূল্যবান।

সাংগঠনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান হল একটি প্রক্রিয়া। একসময় যে তথ্য ও নিয়মকে বিশ্বাস করা হয়েছিল বিজ্ঞান ঠিক তা নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ততদিনই চালু যতদিন পর্যন্ত সেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। তত্ত্ব যদি তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে না পারে তখন সেই তত্ত্বের পরিবর্তন হয়। অনেক সময় বিজ্ঞানীরা তত্ত্বকে বাতিল না করে আরও ভালো তত্ত্ব হাজির করেন এই আশা রেখে যে ভবিষ্যতে তার আরো উন্নতি ঘটবে। এ কারণেও মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান, যে-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পরিস্থিতি অনুসারে হবে। এজন্য মার্কসবাদ কোনো বুলি বা আপ্তবাক্য নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সার্থকতা যেমন প্রয়োগে, মার্কসবাদী বিজ্ঞানের সার্থকতাও তার প্রয়োগে। বিপ্লবী পার্টির সংগঠনও বিজ্ঞান-নির্ভর।

বাঁচার জন্য মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম করেছে। প্রকৃতিকে আয়ত্ত্বে এনে মানুষ বস্তুগত মূল্য তৈরি করার জন্য তাকে ব্যবহার করেছে। তার এই বস্তুগত উৎপাদনের চরিত্র সামাজিক। উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ অন্যদের সঙ্গে কিছু উৎপাদন সম্পর্কে যুক্ত হয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ প্রকৃতিকে পরিবর্তনও করেছে। নিজেদের এবং সম্পর্কগুলিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রাচীন যুগের মানুষের জীবন, সামাজিক সংগঠন ও চেতনা আজকের মতো ছিল না। আগামীদিনেও আজকের মতো তা থাকবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে লড়াইয়ে মানুষ বস্তুত সমাজকে যেমন পরিবর্তন

করেছে সেইসঙ্গে নিজেদেরও পরিবর্তন করেছে। এ পরিবর্তনের প্রয়োজন ফুরোয়নি বরং বর্তমান সময়ে আরও বেড়েছে। এজন্য 'জার্মান আইডিওলজি'-তে মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছেন: ''সর্বহারা শ্রেণীকে সচেতনভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে সে নিজেকে এবং সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে।''

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কখনও নিজেদেরকে বিশুদ্ধ মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ তারা নিজেদের পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করবে না। নিজেদের বদলাতে না পারলে আমরা সমাজকে বদলাতে পারবো না। প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরিবর্তনশীলতার বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সমাজের পরিবর্তনের আমরা ঘটাতে পারি। এই সমাজে জন্মে এবং ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় বড় হয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বকীয় মতবাদ, অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও সংস্কার আমরা বহন করি। এর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই ছাড়া আমরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবো না, শত্রু সম্পর্কে প্রকৃত বোঝাপড়া গড়ে উঠবে না, সামাজিক বিকাশের সূত্রগুলি সম্পর্কে এবং বিপ্লবী আন্দোলন ও সমাজবাদ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অভাব থাকবে।

এই লড়াইতে দেখা যায় কারো দ্রুত অগ্রগতি, কারো ধীর অগ্রগতি, কারো পিছিয়ে পড়া এবং অন্যদের পেছনে ফেলে কারও কারও এগিয়ে যাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে ন্যূনতম মান অর্জন করা এবং তাকে উন্নীত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আমাদের থাকা দরকার। কর্মীদের মানের পার্থক্য আছে; কারণ তাদের সামাজিক পটভূমি এক নয়। বিভিন্ন রকমের সামাজিক প্রভাবের ছাপ তাঁদের ওপর থাকে, তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকে। সংগ্রাম সম্পর্কেও সম-মনোভাব ও সম-সক্রিয়তার পার্থক্য থাকে। তাঁদের বিকাশের গতিও বিভিন্ন রকমের। কমিউনিস্টসুলভ আচার আচরণেও তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। একই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকলেও মান ও অভিজ্ঞতায় আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। এ কারণে মাও সে তুঙ বলেছেন : ''প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সত্য আবিষ্কার করো। যাচাই করো এবং প্রয়োগ করো, আরও বিকশিত করো। অনুশীলন করো; জ্ঞান অর্জন করো। আবার অনুশীলন করো; আবার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। এটা একটা অন্তহীন আবর্তন। প্রত্যেকটি আবর্তনে অনুশীলন এবং জ্ঞানার্জন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। এটাই জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক বস্তুগত তত্ত্বের সামগ্রিকতা। এটাই জানার ও কাজ করার তত্ত্ব।''

চীনের পার্টির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিউ সাও চি বলেছিলেন ''সাফল্যে কিছু পার্টি সদস্যদের মাথা ঘুরে যায়। তারা উদ্ধত ও আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। তারা এমনকি তাদের মূল বিপ্লবী গুণাবলী হারিয়ে দোদুল্যমানতায় ভুগতে পারে বা অধঃপতিত হতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত খুব একটা কম নেই। নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য তাকে অনুশীলনের মধ্যে থাকতেই হবে। একাকী বিচ্ছিন্ন থেকে সে কখনই নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে না।''

১৯৭৮-সালে অনুষ্ঠিত আমাদের পার্টির সালকিয়া সাংগঠনিক প্লেনামে গৃহীত দলিলের শেষে বলা হয়েছে ''সাংগঠনিক পরিস্থিতির যথাযথ মোকাবিলা করতে পার্টির সর্বস্তরের কমিটি এবং তার সদস্যদের মতাদর্শগত মান উন্নত করতে হবে। সর্বোপরি এর অর্থ হলো আত্মবিকাশের জন্য মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের নিরন্তর অনুশীলন ও বিকাশের জন্য আত্মশিক্ষা যারা বর্জন

করে তারা পার্টির সাংগঠনিক শুদ্ধিকরণের (রেক্টিফিকেশন) সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে না।" আমাদের পার্টির সাংগঠনিক নীতিও পরিচালিত হয় মার্কসবাদী বিজ্ঞান এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে। আমাদের পার্টি কর্মসূচীর ৮.৪ধারায় বলা হয়েছে, "পার্টি নিজেকে নিরন্তর শিক্ষিত, পুনঃশিক্ষিত করবে, পার্টির মতাদর্শগত তাত্ত্বিক মান পুনর্নবীকরণ করবে এবং পার্টির সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তুলবে।"

পার্টিতে অন্তর্ভুক্তি

পার্টি সদস্যপদের জন্য লেনিন যে শর্ত আরোপ করেছিলেন তা হলো (১) পার্টি কর্মসূচী ও নীতি গ্রহণ করা (২) পার্টির কাজে অংশগ্রহণ (৩) পার্টির শৃঙ্খলা মেনে চলা।

পার্টি সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তিকরণে যে পদ্ধতি আমাদের পার্টি অনুসরণ করছে সহায়ক গ্রুপের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার কাজ ও বিকাশ যাচাই করা এবং সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতে এক বছরের জন্য প্রার্থী সভ্য করা। এ সময়ের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাকে পূর্ণ পার্টি সভ্যপদে উন্নীত করা। একমাত্র যাতে সচেতন, সক্রিয় ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্যরা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পার্টির শ্রেণী বিন্যাসের জন্য শ্রমিকশ্রেণী থেকে সচেতন, সক্রিয় ও সাহসী কমরেডদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে বলা হয়। পার্টির মধ্যে এই শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে নিয়মিত পর্যালোচনা হয়। তার অর্থ এই নয় শ্রমজীবীদের অন্যান্য অংশ, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত এবং এমনকি অন্যান্যদের পার্টি থেকে বাইরে রাখা হয়। সমাজের প্রত্যেক নিপীড়িত শোষিত মানুষের নেতা হিসেবে পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য। ভারতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, তপসিলী জাতি এবং মহিলাদের মধ্য থেকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পার্টি থেকে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্মী তৈরিতে ভাবনার দৈন্যতা, প্রয়োগে অসতর্কতা ও অসচেতনা এবং অসম মানদণ্ড বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং সংশোধনী প্রক্রিয়াও অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। জনগণের মধ্যে নিবিড় কাজ করার ক্ষেত্রে এসব ত্রুটির প্রতিফলন দেখা যায়।

ক্যাডার নীতি

ক্যাডার বাছাই এবং তাদের তৈরি করা পার্টি সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৬৭ সালে গৃহীত পার্টি সংগঠন সম্পর্কিত দলিল এবং পরবর্তী সময়ের পার্টি সংগঠনের দলিলগুলিতে সঠিক ক্যাডার নীতি রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার থেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্যে 'ক্যাডার' শব্দটি এসেছে যেমন রণনীতি, রণকৌশল, ভ্যানগার্ড ইত্যাদি শব্দও এসেছে। বিভিন্ন পার্টি কমিটির সদস্য এবং গণসংগঠনের কাজে যুক্ত পার্টি সদস্য নিয়েই ক্যাডার। ক্যাডার হবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য আত্ম-নিবেদিত, পার্টির প্রতি বিশ্বস্ত, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরীক্ষিত, জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং যে-কোন দায়িত্ব নিয়ে তা সম্পন্ন করতে ও

সিদ্ধান্ত নিতে দক্ষ। সর্বক্ষণের ও আংশিক উভয় ধরনের ক্যাডারই পার্টির মধ্যে কাজ করে।

ক্যাডার তৈরিতে গণফ্রন্টের আন্দোলনের সচেতন ও অগ্রণী কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তিকরণে ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণদানের কাজের দিকে সংশ্লিষ্ট স্তরের পার্টি সংগঠনের সবসময় নজর রাখা অপরিহার্য। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত চেতনার মান উন্নত থেকে উন্নততর করা এবং কাজের মধ্যে তা প্রয়োগে প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে একজন সদস্যকে বস্তুনিষ্ঠ দিক থেকে দক্ষ ক্যাডার হিসেবে গড়ে তোলা যায়। ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, মাপকাঠি হবে যোগ্যতা ও দক্ষতা। এই ক্যাডারদের গড়ে তুলতে হলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদিত সংগঠকরা।

যেমন, ক্যাডারের জন্য নির্দিষ্ট কাজ: তাকে অবাধে করার সুযোগ দিতে হবে যাতে সে দায়িত্ব সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করে সাহস সঞ্চয় করতে পারে। তবে সময়মতো পরামর্শ দিতে হবে যাতে পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও লাইন অনুযায়ী সে তার উদ্যমের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে। তাদের আত্ম-শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা মতাদর্শগত উপলব্ধি ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারে। তাদের কাজের নিয়মিত চেক-আপ প্রয়োজন; অভিজ্ঞতা থেকে মূল শিক্ষা নিতে আত্মবিকাশের জন্য তাদের সাহায্য করতে হবে যাতে তারা অর্জিত সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিতে পারে। চেক-আপ হলো না, অথচ গুরুতর কিছু ভুল করে ফেললে কঠোর ভাষায় সমালোচনা ও নিন্দা করলাম — এতে তারা আগ্রহ ও উদ্যম হারিয়ে ফেলতে পারে। ভুল করলে আন্তরিকতা নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং ভুল শুধরে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। যারা গুরুতর ভুল করেছে এবং ভুল সংশোধনের জন্য পরামর্শ নিতে অস্বীকার করে এবং আবার ভুল করে, এরকম প্রবণতার বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার সঙ্গে লড়াই জারি থাকবে। তাদের কাজের ক্ষেত্রে কিংবা নিজস্ব বা পারিবারিক কারণে সমস্যার মধ্যে পড়লে তাদের সহায়তা করতে হবে। একঘেঁয়ে কাজ যেন সে তার অর্পিত দায়িত্বকে মনে না করে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। উদারনীতিক মনোভাব, ঔদাসীন্য বা খবরদারি এবং শৃঙ্খলা ও পার্টির সাংগঠনিক রীতিনীতি সম্পর্কে ভুল ধারণা বা অপব্যাখ্যা ইত্যাদি ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক থেকেই ক্যাডারদের তৈরি করার কাজ যত্ন সহকারে করা দরকার। স্তালিনের সংজ্ঞায়, ‘‘মালি যেমন বাগানে তার প্রিয় গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করে, ক্যাডারদেরও সেইভাবে পরিচর্যা করতে হবে।’’

পার্টির সাধারণ সদস্য ও জনগণের সঙ্গে যাঁদের নিত্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে সেইসব উচ্চ চেতনাসম্পন্ন পার্টি নেতারা হুকুম করা পছন্দ করেন না। তাঁরাই দক্ষ কর্মী বাছাই করে টেনে তুলতে পারেন। এ ধরনের কর্মীর অভাব নেই, কিন্তু বাছাই করার নেতৃত্বের অভাব আছে।

প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত গুণ কী আছে তা দেখে তার সদ্ব্যবহার করা, কোন্ কাজে কাকে নিয়োগ করলে সর্বোত্তম কাজ পাওয়া যায়, ক্যাডার তৈরিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ। খাঁটি, আদর্শ ও নির্ভুল লোক এবং সবকিছুতে পারদর্শী লোক বলে কিছু নেই। এটা অবাস্তব। পারস্পরিক আলোচনা ও মতাদর্শগত মানের নিরন্তর উন্নতির চেষ্টার মাধ্যমে ক্রমাগত

ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সংশোধন করে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদিত এই সংগঠকরা এমন অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন যে, এমন অনেক ভালো ভালো নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মীকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, প্রলোভনের মধ্যে টেনে নেওয়া হয়েছে; অথচ যথাযোগ্য সহায়তা ও দায়িত্ব পেলে অনেক বেশি সফল কাজের মধ্য দিয়ে পার্টির অমূল্য সম্পদ যারা হয়ে উঠতে পারতো। ভালো কমিউনিস্ট, আরও ভালো কমিউনিস্ট হবার জন্য কিভাবে ব্যক্তিবিশেষকে নিজেদের ও সকলকে উদ্যমী করা যায়, এই সংগঠকরা সেদিকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ডিমিট্রভের কথায়, ‘‘দুটি বিষয়ের ওপর পার্টির ঐক্য, শৃঙ্খলা ও লড়বার ক্ষমতা নির্ভর করে। এক, পার্টি সদস্যদের উপর। দুই, পার্টির নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের উপর।... অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যাদের নৈপুন্য আছে তারা সাধারণত চুপচাপ থাকে, নিজেদের আড়ালে রেখে কাজ করে। আর যারা বাক্সর্বস্ব তারাই নিজেদের ঠেলে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এই কর্মনিপুণ অথচ চুপচাপ, তাদের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যাদের কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা আছে, তাদের খুঁজে বের করে পথ দেখাতে হবে। আত্মমর্যাদাশীল, নিষ্ঠাবান, কমবয়েসী অনেকে আছে যাদের সাধারণ বুদ্ধি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে। তাদের শক্তির সদ্ব্যবহার করতে তাদের টেনে তোলার ব্যবস্থা চাই। তাদের আত্মবিকাশ ঘটাবার জন্য সাহায্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক আদর্শের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে ক্যাডারদের উপর।’’

কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে এবং মার্কস থেকে লেনিন ও পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানি যে প্রচন্ড দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত কিছু বিদ্রোহ, প্রতিবাদ হতে পারে। অনেক সময় তা গৌরবজনক হলেও তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে না। একমাত্র বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব জনগণকে সচেতনভাবে সঠিক অভিমুখে পরিচালিত করতে পারলে তবে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ততার বেড়া অতিক্রম করতে পারে। এ কারণে একটা বিপ্লবী পার্টির যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার : (১) পার্টিকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, পার্টির ভিত্তি হবে ইচ্ছার ঐক্য ও সংগ্রামী কাজের ঐক্য। (২) পার্টি পরিচালিত হবে বিপ্লবের বিজ্ঞান অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দ্বারা। বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ত করা এবং প্রকৃত বিকাশমান পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করার দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (৩) পার্টি দৃঢ়ভাবে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এবং জনগণকে বিপ্লবী পরিস্থিতিতে নেতৃত্বদানের অবস্থায় থাকবে।

শৃঙ্খলা

পার্টি হবে খুব উন্নতমানের শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ঐক্যবদ্ধ। এই শৃঙ্খলা সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা নয়, স্বেচ্ছাকৃত শৃঙ্খলা। পার্টি সদস্যরা স্বেচ্ছায় ও চেতনা সহকারে এই শৃঙ্খলা মেনে নেবে। পার্টি সদস্যদের সম্মিলিত ইচ্ছা, সংগ্রাম ও কাজের মধ্যে এবং তাদের

ঐক্যের ওপর নির্ভর করে লৌহ কঠিন শৃঙ্খলা। এ শৃঙ্খলার অর্থ এই নয় যে, পার্টির মধ্যে মতামত নিয়ে বিতর্ক বা সমালোচনা হবে না। সমস্ত রকমের আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শৃঙ্খলা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পার্টির সর্বস্তরে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইচ্ছার ঐক্য কার্যকরী রূপ পেতে পারে যদি এসব স্তরগুলির মধ্যে নিয়মিত মতের আদান-প্রদান নিশ্চিত করা যায়। এ কারণে উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত নীচের স্তরে কমিটিগুলিকে রিপোর্ট করা এবং প্রত্যেক ইউনিটের মতামত ও রিপোর্ট উচ্চতর কমিটিকে জানানো ও রিপোর্ট করা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। সকলের জন্য একই শৃঙ্খলা, একই সাংগঠনিক বিধি। শৃঙ্খলাপরায়ণতা দৃঢ় হতে পারে কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা যদি সবসময় ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস জারি থাকে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত দলিলে বলা হয়েছে : ‘‘কমিউনিস্ট পার্টির মূল সম্পদ কর্মীরাই। জনগণের সমর্থন অর্জনের জন্য তাঁদের নিঃস্বার্থ কাজ, সরল জীবনযাপন ও আদর্শনিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ...এই ক্ষেত্রেই ক্ষয় ঘটেছে বেশি।’’

তিনটি সাংগঠনিক নীতি

কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ জীবনের মূল স্তম্ভ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রিকতা অবিচ্ছিন্ন ও সংমিশ্রিত। এ দুটো দিক কখনই পৃথক করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে কেন্দ্রিকতার অর্থ আনুষ্ঠানিক ও যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নয়। এর অর্থ কমিউনিস্ট কাজকর্মের কেন্দ্রিকতা। এই কেন্দ্রিকতার অর্থ শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠন করা যারা যে-কোন পরিস্থিতিতে পার্টি সংগঠনকে তৈরি রাখবে এবং একইসঙ্গে যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম। জমিদার বা শিল্প মালিকদের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত থাকে। কৃষক বা শ্রমিকদের ভালো মতামতের কোন দাম তাদের কাছে থাকে না। এই আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রিকতা দিয়েই তারা শ্রমিক বা জনগণের ওপর আধিপত্য চালায়। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিকতা ঠিক এর বিপরীত। কেন্দ্রিভূত নেতৃত্বের কথা বাদ দিয়ে কেউ কেউ সবসময় আন্তঃগণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে। কিন্তু তারা পার্টির শৃঙ্খলার তোয়াক্কা করে না। আবার শুধু কেন্দ্রিকতা ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার মতো গুরুতর বিচ্যুতিও দেখা যায়। উভয় বিচ্যুতিই পার্টির ক্ষতি করে।

বুর্জোয়া মাধ্যমের সর্বস্তর থেকেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ওপর দীর্ঘকাল ধরেই আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এমনকি কিছু পেটি বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীও একটু ভিন্ন সুরে বুর্জোয়া মাধ্যমের সঙ্গে গলা মেলায়। এ নিয়ে আমাদের পার্টির ওপরও বুর্জোয়া মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের আক্রমণ চলছে। এই নীতিকে একনায়কতন্ত্রী ও গণতন্ত্র বিরোধী (বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির মেকি ও অসার গণতন্ত্রের ভিত্তিতে) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের সময় পার্টির সাংগঠনিক সংস্কার ও আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করার নামে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ক্ষয়ের সংশোধনের পরিবর্তে গোটা নীতিকেই সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছিল

যা গোটা পার্টির ধ্বংস ডেকে আনে।

পার্টি কাঠামোর ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নির্দেশাত্মক নীতির সাতটি বিষয় পার্টির গঠনতন্ত্রের ১৩নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষত গোটা পার্টির যৌথ পরিচালনার নীতির ভিত্তিতে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত পার্টি কমিটিকে অবশ্যই কঠোরভাবে যৌথ সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করে চেক-আপ করার নীতি মেনে কাজ করতে হবে।

পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাত দফা নীতিও গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে সালকিয়া প্লেনামে এ-সম্পর্কিত নির্দেশাত্মক নীতি যে সঠিকভাবে পালিত হয়নি তা পরবর্তী সময়ে পার্টি কংগ্রেসগুলির পর্যালোচনা, ১৯৯২ সালে চতুর্দশ কংগ্রেসে সংগঠন সম্পর্কিত পর্যালোচনা, ১৯৯৬ সালে পার্টির শুদ্ধিকরণ অভিযানের দলিলে এবং পরবর্তী দুই দশকে সাংগঠনিক পর্যালোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এই শুদ্ধিকরণ অভিযান সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে এক অপরিহার্য সাংগঠনিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। পার্টির ২৪তম রাজ্য সম্মেলনেও এ সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে।

সংগঠনের মতাদর্শগত কাজ

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে স্বচ্ছ বোঝাপড়া এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি তা প্রয়োগ করার মতো দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা প্রয়োজন। পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পার্টি নেতাদেরও শিক্ষা ও পুন:শিক্ষার আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করতে জনগণ থেকেও শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। কেবল পার্টি কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে উপলব্ধি গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয়, মতাদর্শগত দুর্বলতা অতিক্রম করার জন্য সালকিয়া প্লেনাম থেকে বলা হয়েছিল "বিরামহীন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে দেশে অমার্কসীয় বা মার্কসবাদ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদগুলির বিরুদ্ধে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, গান্ধীবাদ, উৎকট স্বাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, জাতপাত বিভেদ, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নতুন কর্মী ও জনগণকে শেখাতে হবে এসব মতবাদ কোন শ্রেণী থেকে কিভাবে এসেছে। জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই আরও বেশি প্রয়োজন, যেহেতু শাসকশ্রেণীগুলি ও তাদের অনুগামীরা জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে অনবরত প্রতিক্রিয়ার এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করছে।" একমাত্র এই লড়াই আমাদের মতাদর্শগত কাজে প্রাণসঞ্চার করতে পারে। সাড়ে তিনদশক পরেও এই সমস্যাগুলো আরও তীব্র আকার নেওয়ায় এই লড়াইয়ে অনেক বেশি গতিবেগ সঞ্চার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জনগণের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি

পার্টি জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকলে পার্টি সংগঠনের কাজ সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। জনগণকে সংগ্রামের ময়দানে শামিল করা এবং শত্রু-মিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা যাতে আন্দোলনের মধ্য থেকে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার নেতৃত্বদানের এবং যোগ্যতা পার্টি সংগঠনকে অর্জন করতে হবে। জনগণের ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা সঠিকভাবে যাচাই করেই আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক হয়। নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদাকে জনগণের ইচ্ছা ও চাহিদা বলে গণ্য করলে ভুল হতে বাধ্য। তীব্র প্রচার আন্দোলন ছাড়াও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে একমাত্র জনগণকে আরও বেশি লড়াইয়ের ময়দানে শামিল করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে আশু স্থানীয় ও আংশিক দাবি নিয়ে লড়াইয়ের মাধ্যমে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তারা ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। গণচেতনার এটাই প্রাথমিক অধ্যায়। এ কাজ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে যদি বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে পার্টি তৈরি করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের সবচেয়ে সচেতন অংশকে পার্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পার্টি গঠনের এই প্রক্রিয়ায় বহুরকমের ঝোঁক ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হয়। যেমন সংকীর্ণতাবাদ ও সংশোধনবাদ, বিভিন্ন রকমের বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব, অতি-গণতন্ত্র ও শৃঙ্খলাহীনতা, আমলাতান্ত্রিকতা, উদারনৈতিকতা, সামগ্রিকতা বাদ দিয়ে স্থানীয় বিষয়কে সর্বেসর্বা করে তোলা ইত্যাদি। সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে সত্যিকারের অর্থে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ওপর।

ভুলত্রুটি সংশোধন (রেকটিফিকেশন) অভিযান ও লড়াকু পার্টি গড়ে তোলা

ভুলত্রুটি সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য কাজের ধরনের উন্নতি ঘটানো, সাংগঠনিক ত্রুটিসমূহ সংশোধন করা এবং পার্টির সদস্যদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চেতনা বৃদ্ধি করা। পার্টির মতাদর্শ ও পার্টির চরিত্রকে নিস্তেজ করার মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণীগুলি কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল ও বিপর্যস্ত করতে চায়। সেই কারণে এই ধরনের প্রভাব ও হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করা সবসময় প্রয়োজন। পার্টির বিপ্লবী চরিত্র রক্ষা করতে ভুলত্রুটি সংশোধন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। একবারের চেষ্টায় বা একটি অভিযানের মধ্য দিয়ে তা সেরে ফেলার বিষয় নয়। পার্টিকে আরও লড়াকু, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে তোলার জন্য ভ্রান্ত প্রবণতা ও দোষত্রুটির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান চলতে থাকবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯২ সালে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবে পার্টির মধ্যে জমে ওঠা ভুলত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৬ সালে এই ভুলত্রুটি সংশোধন অভিযানের দলিল তৈরি হয়। যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে অবাঞ্ছিত ঝোঁক ও প্রভাব পার্টির মধ্যে ঢুকে পার্টি সদস্যদের ও পার্টি সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা ১৯৯৬ সালে দলিলে উল্লেখ করা হয়। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি এই দলিলকে সময়োপযোগী করে। এই মূল্যায়নে বলা হয়

সমস্যার উপসর্গগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটলে তবেই পার্টিতে সেগুলো দেখা হয়, সমস্যার গভীরে যাওয়ার জন্য বেশিকিছু করা হয়নি এবং সমস্যার মৌলিক উৎস নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে তদনুযায়ী রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২০০৯ সালের এই প্রস্তাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন বিচার করে ৪টি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। (১) সংসদ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে। (২) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। (৩) বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা রক্ষা। এবং (৪) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং প্রগতিশীল মূল্যবোধ উর্ধ্বে তুলে ধরা।

পার্টি সংগঠনকে উদারনৈতিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য মাও সে তুঙ ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব সফল হবার অনেক আগে ১৯৩৭ সালে ডাক দিয়েছিলেন 'উদারনৈতিকতাকে মোকালিা কর'। এছাড়া সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে ও তখন চীনের পার্টিতে অভিযান পরিচালিত হয়। এমনকি বিপ্লবের পরও ১৯৫৬ সালে আমলাতান্ত্রিক ও আত্মগত ধারণাজনিত (Subjectism) ভুলগুলি সতর্ক থাকার তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। লেনিনীয় সাংগঠনিক নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে নিত্যনতুন অবাঞ্ছিত ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েত পার্টিতে লড়াই করার ডাক দেওয়া হয় ধারাবাহিকভাবে, এমনকি ১৯৫২ সালে ১৯তম পার্টি কংগ্রেসও এই আহ্বান জানায়।

গণসংগঠন

শ্রমিকশ্রেণী এবং গণসংগঠনসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস এবং পরবর্তী সময়ে লেনিনকে ভ্রান্ত ও সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাতে হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হওয়ার আগেই শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠন ছিল ট্রেড ইউনিয়ন, এছাড়া ছিল সমবায় সমিতি। সেইজন্য তখন একটা ধারণা হয়েছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণমুক্ত করে সমাজবাদ অর্জন করবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গঠিত হওয়ার পর প্রাথমিক দাবিদাওয়া এবং প্রাথমিক চেতনার পর্যায়ের মধ্যে সীমিত না রেখে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের বিপ্লবী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন লেনিন; "বৃহত্তর অর্থে তাদের গোটা পৃথিবীতে আস্থা তৈরি করতে হবে যে তাদের প্রচেষ্টা সংকীর্ণ ও আত্মস্বার্থজনিত লক্ষ্য নয়। তাদের লক্ষ্য কোটি কোটি নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুক্তি।"

শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল উদ্ভবের পরেই পার্টি ও গণসংগঠনের মধ্যেকার সম্পর্ক সামনে আসে। বিপ্লবে পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকায় ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রায়িত করেন লেনিন। মার্কসের সময় থেকেই রাজনৈতিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্কের প্রশ্নটি প্রবল বিতর্কের মধ্যে থাকে। ট্রেড ইউনিয়নের ওপর যারা পার্টির ছাপ লাগায় এবং ট্রেড ইউনিয়নকে পার্টির পকেটের সংগঠন বানাতে চায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নারদনিক ও বিলোপকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন লেনিন। নভেম্বর বিপ্লবের পরে আবার বিষয়টি আসে যখন জার্মানির বামপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে কাজ

করতে অস্বীকার করে। (বামপন্থী কমিউনিজম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা)। এই দীর্ঘ লড়াইয়ে লেনিন শিক্ষা দিয়েছেন যে গণসংগঠনের স্বতন্ত্র চরিত্র থাকবে, তাদের নিজস্ব স্তরের চেতনা থাকবে যেটা সবসময় পার্টি নজরের মধ্যে রাখবে। পার্টি নেতৃত্বকারী এবং পরামর্শদানকারী ভূমিকাকেও তিনি উল্লেখ করেন যাতে পশ্চাদপদ জনগণের চেতনাকে উন্নীত করা যায় এবং ধীরে ধীরে পার্টির বিপ্লবী স্লোগান গ্রহণ করতে তাদের টেনে আনা যায়। পার্টি এ কাজ করতে না পারলে ছোটখাটো কিছু সংস্কার অর্জনের মধ্যেই জনগণের চেতনা সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থনৈতিক দাবিতে সংগ্রামের মধ্যেই সাধারণ জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের হাতেখড়ি হয়। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই প্রাথমিক চেতনাকে গণতান্ত্রিক চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উন্নীত করাই পার্টির মূল লক্ষ্য এবং গণসংগঠনের পার্টিকর্মীরা এই লক্ষ্য সামনে রেখেই ব্যপক জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ রেখে কাজ করবে। ফ্যাসিজমের উদ্ভবের সময় গণসংগঠনের কাজের ধরন ও কৌশলের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর থেকে এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ থেকে শিক্ষা নিয়ে পার্টি গণসংগঠন পরিচালনার চেষ্টা করে আসছে। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত করে তোলার কাজ যখন প্রচন্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত তখন পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও অন্যান্য গণসংগঠন তৈরি হয়। কিন্তু গণসংগ্রাম এবং ঐক্যের জন্য এই সংগঠনগুলো কাজ করে চলেছে। 'কী করতে হবে' বইতে লেনিন শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এটা সব গণসংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই কারণে গণসংগঠনগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্লোগান ও কার্যক্রম এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে তা জনগণের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশকেও আকৃষ্ট করতে পারে।

পার্টি কর্মসূচীতে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে আশু কর্মসূচী হিসেবে বলা হয়নি। বর্তমান স্তর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। কোন কোন গণসংগঠনের লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রও বলা হয়। বিপ্লবের বর্তমান স্তর সম্পর্কে পার্টির যে বোঝাপড়া তার সঙ্গে এ সময়ে সমাজতন্ত্রের স্লোগান সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অবশ্য সমাজবাদের স্লোগান মেনে না নিলে গণসংগঠনের সদস্যপদ করা হবে না এরকম কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেই। গণসংগঠনগুলি সঠিকভাবেই জনগণের ওপর আক্রমণ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদ, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ছাত্র-যুব-মহিলাদের আশু দাবি নিয়ে লড়াই করে। এটা জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক দাবিতে আন্দোলনের বাইরে সাধারণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দাবিগুলি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সমাজকে জড়ো করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

পার্টির গণভিত্তি প্রসারে গণসংগঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মৌলিক পরিবর্তনের জন্য পার্টির স্লোগান যেমন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ ইত্যাদি স্লোগান সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। ব্যাপক জনগণ আকৃষ্ট হয় তাঁদের আশু দাবি পূরণ নিয়ে, যে দাবিগুলি আদায় করা সম্ভব বর্তমান ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ না করেই। এক্ষেত্রে পার্টির কাজ গণসংগঠনের কাজের মতো হতে পারে না। পার্টিকে বাদ দিয়ে পার্টির মুখপাত্র হিসেবে গণসংগঠনগুলোকে টেনে নিয়ে

যাওয়ার পরিণামও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

১৯৮১ সালে পার্টি গণসংগঠন সম্পর্কে দলিল প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায় পার্টি ও গণসংগঠনের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েই গেছে। ২০০৪ সালে 'গণসংগঠনের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি' সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে গণসংগঠন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সময়োপযোগী করা হয়। এটা ঠিক যে ব্যাপক পশ্চাৎপদ চেতনার জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কের সেতু হল গণসংগঠন। বুর্জোয়া পার্টিগুলিও তাদের কুক্ষিগত গণসংগঠন করে এবং সেটা করে ভোটব্যাঙ্কের জন্য। জনগণের এবং শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের জন্য নয়। সেইজন্য গণসংগঠনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির আকাশ-পাতাল ফারাক। শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য গঠনের জন্য যেসব সংস্কারবাদী ইউনিয়নের পেছনে গণসমর্থন আছে তাদের সঙ্গে কাজ করতে কমিউনিস্টরা দ্বিধাবোধ করে না। ২০০৪ সালের দলিলে তিনটি মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; (১) গণসংগঠনগুলির স্বতন্ত্র কার্যধারা গড়ে তোলা যাতে তারা একটা ব্যাপক মাত্রার চরিত্র অর্জন করতে পারে এবং জনগণের নতুন অংশের কাছে পৌঁছাতে পারে। (২) গণসংগঠনের গণতান্ত্রিক কাজ ও পরিচালনা সুনিশ্চিত করা এবং যুব-ছাত্র-মহিলা সংগঠনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসেবে তার চরিত্র বজায় রাখা। (৩) পথনির্দেশক ভূমিকা এবং পার্টির গঠন সম্পর্কে একটা যথার্থ বোঝাপড়া।

গণসংগঠন সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য রূপায়ণের জন্য পার্টির অভ্যন্তরে প্রচারের যে ভিত্তি হবে তা নিম্নরূপ; (১) গণসংগঠনের স্বতন্ত্র ভূমিকা ও গণতান্ত্রিক পরিচালনা সুনিশ্চিত করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের গণসংগঠনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে হবে। (৩) গণসংগঠনের নিজস্ব নিয়মপদ্ধতি আছে। পার্টি পরিচালনার নীতিপদ্ধতি গণসংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। গণসংগঠনের পার্টি সাব-কমিটি এবং ফ্র্যাকশন কমিটির সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে পার্টিকর্মীদের শিক্ষিত করতে হবে। (৪) গণসংগঠনে কর্মরত পার্টি সদস্যরা পার্টি শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য থাকবে এবং পার্টির সিদ্ধান্ত তাদের মেনে চলতে হবে। গণসংগঠনের কাজ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে পার্টির বিকাশের জন্য তাঁদের অবদান রাখতে হবে। (৫) পার্টি তৈরি করা, পার্টির নীতি রূপায়ন এবং পার্টির সাধারণ নির্দেশিকার পর্যালোচনা প্রত্যেক গণফ্রন্টকে করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। বছরে কমপক্ষে একবার এই পর্যালোচনা পার্টি কমিটিতে আলোচনার জন্য রাখতে হবে। (৬) গণতান্ত্রিক পরিচালনা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য কমিটিকে চেক-আপ করতে হবে। কোন কোন গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সম্মেলন করেনি, কর্ম পরিষদের সভা নিয়মিত করে না এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য পার্টি সংশ্লিষ্ট কমরেডদের দায়ী করবে। (৭) যেখানে পার্টি ও গণসংগঠনের তহবিল একসঙ্গে আছে তা পৃথক করতে হবে। গণসংগঠনে পৃথক ও যথার্থ হিসেব রক্ষা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা চেক-আপ করতে হবে। (৮) প্রত্যেক রাজ্যে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে শ্রেণী ও গণসংগঠনের মূল কর্মকর্তাদের তাদের বেশিরভাগ সময় সংগঠনের কাজের জন্য ব্যয় করতে হবে। (৯)

প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে কোনও-না-কোনও গণসংগঠনে কাজ করতে হবে। গণসংগঠনের জন্য পর্যাপ্ত ক্যাডার পার্টি কমিটিগুলিকে দিতে হবে। এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর গণসংগঠনে তাদের চাহিদা নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করতে হবে। (১০) পার্টির নীতির ভিত্তিতে সাব-কমিটি ও ফ্র্যাকশন কমিটিকে কাজ করতে হবে। গণসংগঠনের দৈনন্দিন কাজ এখানে আলোচনায় আসবে না। তারা আলোচনা করবে নীতিগত প্রশ্ন, পার্টি নির্মাণ, পার্টিতে অন্তর্ভুক্তি, পার্টির পত্রপত্রিকা ও পার্টির বক্তব্য গণসংগঠনের সদস্যদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং পার্টি কমিটির কাছে তারা রিপোর্ট পেশ করবে।

এটা ঠিক হয়েছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক পদ্ধতির কাজের জন্য এক্ষেত্রে পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটি সবচেয়ে আগে ভূমিকা নেবে।

সাংগঠনিক প্লেনাম

১৯৭৮ সালে সাংগঠনিক প্লেনামের পর ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে পার্টির প্লেনাম হতে চলেছে। পার্টির সম্প্রসারণের জন্য সালকিয়া প্লেনামের বিশেষ নির্দেশিকা ছিল। সাফল্য সত্ত্বেও বলা যায় পার্টির যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি এবং পার্টি স্বতন্ত্র শক্তি বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়নি।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনায় পার্টি লক্ষ্য করে যে পার্টির গণভিত্তির ক্ষয় হয়েছে এবং পার্টি তার রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেনি। এই পরিস্থিতির কারণসমূহ খুঁজে বের করতে পার্টিতে তিনটি বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত হয়েছিল: প্রথমত: পার্টির অনুসৃত রাজনৈতিক-কৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা; দ্বিতীয়ত: আড়াই দশক আগে নয়া-উদারীকরণের সময় থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনগুলি খতিয়ে দেখা ও বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর তার প্রভাব এবং তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে পার্টির কাজের ধারা, সংগঠনের পরিচালনা এবং গণফ্রন্টের পরিচালনা, স্বতন্ত্র কাজ ও পার্টির সঙ্গে গণফ্রন্টের সম্পর্কসহ গণফ্রন্টের কাজের পর্যালোচনা। প্রথম দুটি কাজ ২১তম পার্টি কংগ্রেসে এবং গত আগস্ট মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় চূড়ান্ত হয়েছে। তৃতীয় বিষয়টি পার্টির ডিসেম্বরের সাংগঠনিক প্লেনামে স্থির হবে।

২১তম কংগ্রেস বি জে পি, কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া-জমিদার শক্তিগুলির প্রকৃত বিকল্প হিসাবে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ডাক দিয়েছে। এই ডাকের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকার সম্প্রসারণ এবং পার্টি ও গণফ্রন্টের প্রভূত শক্তিবৃদ্ধির উপর। শাসক গোষ্ঠীর মতবাদ ও রাজনীতির মোকাবিলায় রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে পার্টিকে তার ক্যাডারদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। এই বিরাট কাজ পরিচালনা করতে হলে পার্টি সংগঠনকে সবদিক থেকেই চাঙ্গা করা, রাজনৈতিক-মতাদর্শগত কর্তব্য পালনের জন্য এবং জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা অর্জনের জন্য পার্টিকে সেইভাবে সাজিয়ে তোলা দরকার। পার্টি ও গণফ্রন্টের কাজের রুটিন পর্যালোচনা নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে গভীর ও সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠনে পরিবর্তন আনার জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তার জন্য আগামী ডিসেম্বর মাসের প্লেনাম।

পার্টি কর্মসূচী

সূর্যকান্ত মিশ্র

‘কর্মসূচী’ বলতে কী বোঝায়?

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে একটি দেশের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগের রণনীতিকে কর্মসূচী বলা হয়।

যে কোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তার কর্মসূচিই হলো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দলিল। যখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) ছিল তখন কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের পার্টিগুলিকে কমিন্টার্নের সদস্য পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। এখন কমিন্টার্ন না থাকলেও পার্টির কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র মেনে চলার শপথ বাক্য সংবলিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষরের ভিত্তিতে পার্টি সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির কাজ শুরু হয়। কর্মসূচিকে মৌলিক দলিল বলা হয় কারণ তা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির রণনীতিগত ঘোষণাপত্র। তাই কর্মসূচি কী, তা বোঝার জন্য রণনীতি বলতে কী বোঝায়, তা প্রথমে জানা দরকার এবং রণনীতির সঙ্গে রণকৌশলের পার্থক্য কী, তা বোঝা দরকার।

রণনীতি : বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে সর্বহারা শ্রেণি কার বিরুদ্ধে মূল আঘাত হানবে তা স্থির করা এবং এই কাজে বিপ্লবী শক্তিগুলির কীভাবে সমাবেশ ঘটিয়ে (মূল ও পরবর্তী মজুত বাহিনী) এ লড়াই পরিচালনা করবে তার পরিকল্পনা রচনাই হলো রণনীতি (স্তালিন-লেনিনবাদের ভিত্তি)।

রণকৌশল : রণনীতিকে সামনে রেখে আন্দোলনের নানান পর্যায়ে স্বল্পকালীন আন্দোলন ও সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারণই হলো রণকৌশল। (ওই)

রণনীতির সংজ্ঞায় প্রথম কথাটি হলো ‘বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তর’। তার অর্থ – রণনীতির প্রথম কাজটি হলো বিপ্লবের স্তর ঠিক করা। সেটা স্থির করতে হলে, কর্মসূচির সংজ্ঞায়

শুরুতেই যে কথা বলা হয়েছে সেই কাজটা করতে হবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে একটা দেশের (যে দেশের বিপ্লবের কর্মসূচি রচনা করা হচ্ছে) বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। সে সব আলাদা ক্লাসের বিষয়বস্তু। এখানে এক কথায় বলা যায়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলতে মার্কসীয় দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র – মার্কসবাদের এই তিনটি অঙ্গ বা উপাদান এবং বিংশ শতাব্দীতে তার লেনিনবাদী বিকাশ, এই উভয়ের সমষ্টি বোঝায়। এগুলি আপ্তবাক্য নয়, প্রয়োগের বিজ্ঞান। প্রকৃতি, সমাজ – সব কিছুই বিকাশমান, সুতরাং প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে একটি বিকাশমান বিজ্ঞান হিসাবে আয়ত্ত করতে হবে, প্রয়োগের জন্য। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছে, সমাজ বিকাশের স্তর অনুযায়ী ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করেছে। বিপ্লবের সেই স্তরে দ্বন্দ্বমান শ্রেণিগুলির মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বগুলিকে চিহ্নিত করেছে। শাসকশ্রেণি, যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে তাদের এবং যারা বিপ্লবের প্রধান শত্রু, তাদের চিহ্নিত করেছে, বিপ্লবের মিত্র শ্রেণিগুলি ও তাদের কীভাবে সমাবেশ ঘটিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে তার পরিকল্পনা রচনা করেছে, বিপ্লবের কাজগুলি স্থির করেছে এবং এই বিপ্লব পরিচালনার সংগঠন গড়ে তোলার কাজ নির্দিষ্ট করেছে। অর্থাৎ কর্মসূচি ও রণনীতির সংজ্ঞায় যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সব কিছুই আমাদের পার্টি কর্মসূচিতে আছে। এ বিষয়ে আগ্রহী যে কেউ ১৮৯৯ সালে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির (যা থেকে পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়) কর্মসূচিতে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য পড়ে দেখতে পারেন (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৩)।

আমাদের পার্টি কর্মসূচির মূল বিষয়গুলিতে যাওয়ার আগে রণনীতির সঙ্গে রণকৌশলের সম্পর্ক ও পার্থক্যগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমত, রণনীতি ও রণকৌশলের সংজ্ঞা থেকে এটা পরিষ্কার যে, রণনীতি হলো 'বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তর' যতক্ষণ না তা পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করছে, এই দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য এই দুই স্তরের মধ্যে কোনো চীনের দেয়াল নেই। কিন্তু রণকৌশল হলো স্বল্পকালীন, আন্দোলনের নানান পর্যায়ে, জোয়ার ভাটায়, সংগ্রাম ও সংগঠনের রূপ বদলায় এবং তদনুযায়ী রণকৌশল স্থির করতে হয়। পার্টি কংগ্রেসগুলি সময়ে সময়ে তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী রণকৌশলগত লাইন স্থির করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি দুটি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সময়কালে সেই লাইন প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয়ত, রণকৌশল হলো রণনীতির অধীন। রণনীতিগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার উপযোগী রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ রণনীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো রণকৌশল গ্রহণ করা যায় না। আমাদের পার্টির সপ্তম

কংগ্রেস জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি গ্রহণ করার সময় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি বর্জন করার পাশাপাশি শ্রেণী সহযোগিতার রণকৌশল বর্জন করে শ্রেণী সংগ্রামের রণকৌশল গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয়ত, রণনীতি ও রণকৌশল পরস্পরের পরিপূরকও বটে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রয়োগ করা যায় না। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা লি ডাক থো-র কথায় 'রণনীতি বিবর্জিত রণকৌশল হলো দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, আবার রণকৌশল বিবর্জিত রণনীতি হলো বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ'। আমাদের দেশের সংশোধনবাদী ও বাম হঠকারীদের কাজকর্মে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য পরিষ্কার করার জন্য আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে (যা আসলে রণনীতিগত দলিল) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত প্রশ্নের উল্লেখ আছে। পার্টি কর্মসূচীর ৭.১৩ থেকে শুরু করে ৭.১৮ ধারা পর্যন্ত এগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে নিচে পার্টি কর্মসূচীকে এগারোটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো।

(১) ভূমিকা : পার্টি কর্মসূচি গ্রহণের সংগ্রাম

পার্টি এডুকেশন সিরিজ-২ নং, সি.সি : সি পি আই (এম) অক্টোবর ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য

পার্টি কর্মসূচি শুরু হয়েছে ভূমিকা নিয়ে। যে দীর্ঘ সংগ্রাম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পার্টি স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতার পর ভারতে সমাজতন্ত্র কায়েম করার লক্ষ্যে, জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার সুমহান ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে অবগত করার উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়টি রচিত। তার সঙ্গে পার্টি কর্মসূচি রচনার সংগ্রামের ইতিহাসও জড়িত। নিচে এর একটি কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হলো।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর (বর্তমান ক্যালেন্ডারে ৭ নভেম্বর) নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু দেশত্যাগী বিপ্লবী (মুজাহির) উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ শহরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সহায়তায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শাখাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে কলকাতা, বম্বে, লাহোর, মাদ্রাজ – এই চারটি কেন্দ্রে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এই বছরই সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে ওঠে, যদিও ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাতে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১৯২১ – ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে একটি ইশ্‌তেহার দেওয়া হয়। কংগ্রেস নয়, কমিউনিস্টরাই প্রথম এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি নিয়ে প্রস্তাব আনেন।

১৯২২ – কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে আবার একটি ইশ্‌তেহার দেওয়া হয়। পার্টি তার জন্মলগ্ন থেকে একটানা দুই দশকেরও বেশি সময় জুড়ে বেআইনি ঘোষিত হয়েছিল।

পত্রপত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল এবং তা বাজেয়াপ্ত করা হতো। এছাড়া সদ্য গড়ে ওঠা পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কয়েকবার ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এবছর পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে তা শুরু হয়। এই সময় লেনিন উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে যে থিসিস পেশ করেছিলেন এম. এন. রায় তার বিরোধিতা করেন। তাঁর ভ্রান্ত তত্ত্ব (ডিকলোনাইজেশন) কমিন্টার্ন গ্রহণ করেনি। তিনি কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন। ভারতের কমিউনিস্টরা রায়ের তত্ত্ব গ্রহণ করেননি।

১৯২৪ – কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা/কাকাবাবু, ডাঙ্গে, সওকত ওসমানি অভিযুক্ত/ ওয়ার্কার্স-পেজান্টস পার্টি গঠন।

১৯২৫ – কানপুরে পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সত্য ভক্ত সদ্য গঠিত এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি জাতীয়তাবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। সিঙ্গারভেল্যু চেটিয়ারের সভাপতিত্বে, এস. ভি. ঘাটে ও জে পি বাগেরহাট্টা সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র তৈরি হয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বভারতীয় কেন্দ্র হিসাবে কার্যকর হয়নি। কোনো কর্মসূচী না থাকায় কমিন্টার্নের স্বীকৃতি বাতিল।

১৯২৮ – কমিন্টার্নের কাছে একটি খসড়া কর্মসূচী জমা দেওয়া হয়। এতে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের ছাপ ছিল।

১৯২৯ – কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টির সম্মেলন। সম্মেলনের ঠিক পরেই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ৩১জন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রেপ্তার। এই মামলায় গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ৪জন নেতাকে আসামী করা হয়। ৪ বছর ধরে বিচার চলে। এই মামলাই প্রথম দেশজুড়ে পার্টি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই সময়কালে দেশের মধ্যে ও বাইরে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, কংগ্রেসের একাংশ সহ অনেকে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং এঁরা আগে পরে পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে এটি 'ইনপ্রেকরে' প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ – 'ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' নামে একটি খসড়া কর্মসূচী। ১৯২৮ সালের মতো এটিও স্বীকৃত হয়নি। কমিন্টার্নের স্বীকৃতি বাতিল।

১৯৩৩ – মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ছাড়া পাওয়া বন্দিরা এবং জেলের বাইরে থাকা কমিউনিস্টরা একত্রিত হয়ে ডিসেম্বরে প্রভিসন্যাল কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এটাই হলো প্রথম কার্যকর সর্বভারতীয় পার্টি কেন্দ্র। এদের আলোচনার ভিত্তিতে 'ড্রাফট পলিটিক্যাল থিসিস' তৈরি হয়। পার্টি ও গণসংগ্রামের প্রসার শুরু হয়।

১৯৩৪ – পার্টি আবার বেআইনি ঘোষিত হয়।

১৯৩৫ – কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস : দিমিত্রভ থিসিস, ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের ডাক, ভারত সম্পর্কে রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলে থিসিস ইত্যাদির ভিত্তিতে ভারতে কমিউনিস্টরা কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে কাজ করতে থাকেন।

১৯৩৬ – 'প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন' দলিলটি চূড়ান্ত হয়। পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি পায়। পার্টির বিকাশ দ্রুততর হয়। সারা ভারত কিষান সভা, ছাত্র

ফেডারেশন, প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৩৯-৪২ – ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। যুদ্ধের বোঝা ভারতের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম ও কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি। ১৯৪১-এর ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন – জনযুদ্ধের ডাক – ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির অবস্থান নিয়ে পার্টির ওপর আক্রমণ। মোকাবিলা। পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও জাতীয় সরকার, জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে সঠিক লাইনের ওপর ভিত্তি করে পার্টির প্রসার।

১৯৪৩-৪৭ – পার্টির প্রথম কংগ্রেস : বম্বে ২৩মে – ১ জুন ১৯৪৩ (১৫,৫৬৩ জন সদস্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম মহাসম্মেলন)

যুদ্ধোত্তর সংগ্রামগুলিতে বহু ত্যাগ ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পার্টির প্রসার – তেলেঙ্গানা কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম, বাংলার তেভাগা, পুন্নাপ্রা ভায়লার, উত্তর মালাবার, ওয়ারলি আদিবাসী, ত্রিপুরা উপজাতিদের সংগ্রাম – রাজন্যবর্গ শাসিত রাজ্যসহ পণ্ডিচেরি ও গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম – আই এন এ যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির দাবিতে, নৌবিদ্রোহ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবকদের সংগ্রাম ১৯৪৬ সালে এক নতুন তরঙ্গ শীর্ষে পৌঁছোয় – পার্টি সদস্য সংখ্যা ৫৩ হাজারে পৌঁছোয়। এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সমঝোতার ভিত্তিতে দেশভাগ ও স্বাধীনতা।

১৯৪৮-৫৪ – স্বাধীনতার চরিত্র, দেশের নতুন শাসক শ্রেণীচরিত্র, স্বাধীনতার পর ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ও পথ ইত্যাদি নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের লাইন পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থী হঠকারিতায় পর্যবসিত হয়। রুশ পথ, না চীনের পথ – তা নিয়েও বিতর্ক হয়। ১৯৫০ সালে স্তালিনের পরামর্শের ভিত্তিতে পার্টি নেতৃত্ব একটি খসড়া কর্মসূচি ও কর্মনীতি সহমতের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেন, যা ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক গোপন বিশেষ সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কংগ্রেসেও এটি বিনা বিতর্কে অনুমোদিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পার্টি লোকসভায় প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়। পার্টির লাইন ভুল হলেও পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গণসংগঠনগুলি কয়েক হাজার কমরেডদের জীবনের বিনিময়ে জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল।

১৯৫৫-৬৩ – ১৯৫৫ সালেই বোঝা গেল যে তৃতীয় কংগ্রেসে অনুমোদিত কর্মসূচী ১৯৪৮-এর বাম সংকীর্ণতাবাদী লাইন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলানো যাচ্ছে না। ফলে পার্টিতে কর্মসূচীর মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল এবং কয়েকটি বিকল্প কর্মসূচিগত দলিলের ভিত্তিতে বিতর্কের সূত্রপাত হলো। এই সময় স্তালিনের পর ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের সংশোধনবাদী লাইন নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিতর্ক শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটে চতুর্থ পার্টি কংগ্রেস পালঘাটে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস কার্যত তিনভাগে

বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রায় ৩০ শতাংশ প্রতিনিধি কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রেণী সহযোগিতার লাইনের পক্ষে, অন্যান্যরা এর বিপক্ষে এবং মাঝখানে এই দুই লাইনের মধ্যে আপসকারীরা – এইরকম একটা আবহে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানটি স্থান করে নেয়। মনে রাখা দরকার – পরের বছর, ১৯৫৭ সালে কেরালায় ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে বিমোচন সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা সত্ত্বেও সংশোধনবাদীরা কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যের দাবি পরিত্যাগ করেনি। ১৯৫৮ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে একই সাথে কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার লাইন সাময়িকভাবে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখলেও পার্টিতে সংশোধনবাদ ও তার বিরুদ্ধে লড়াই – এই দুই লাইনের মধ্যে সংগ্রাম ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উগ্র-জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিলে সংশোধনবাদীরা শাসকদলের সঙ্গে সহযোগিতার লাইন গ্রহণ করে এবং পার্টির মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে কার্যত কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেশদ্রোহিতার কুৎসা প্রচারের পথ নেয়। এদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য ১৯৫৭ সালের ১২ পার্টির দলিল, ১৯৬০ সালের ৮১ পার্টির দলিল সাময়িক সমঝোতা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই সাময়িক সমঝোতার সময় ১৯৬১ সালে পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস (বিজয়ওয়াড়া) রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আপস করে কোনোমতে ভাঙন এড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে অছিলা করে পার্টি নেতৃত্বের একাংশসহ শত শত কমরেডদের গ্রেপ্তার করে সংশোধনবাদীরা পার্টি দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৬৩ সালে এঁদের অনেকে জেল থেকে ছাড়া পেলেও পার্টিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়। উলটে পার্টি থেকে কমরেডদের বহিষ্কার চলতে থাকে।

১৯৬৪ – এসব সত্ত্বেও ১৯৬৪ সালে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির জাতীয় পরিষদের সভায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কমরেডদের পক্ষ থেকে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার স্বার্থে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের সময়কার সদস্যপদের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা হোক যার সিদ্ধান্ত মেনে চলা সবার পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে। এই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার ফলে ৩২জন জাতীয় পরিষদের সদস্য সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর সমস্ত ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এঁদের বিবৃতি ও আহ্বানের ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে ১৯৬৪ সালের ৭-১১ জুলাই ১৪৬জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একটি বিশেষ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে গৃহীত খসড়া দলিলের ওপর দেশব্যাপী পার্টি ইউনিটগুলিতে আলোচনা, সংযোজন, সংশোধনের ভিত্তিতে ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত পার্টির সপ্তম কংগ্রেস জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কংগ্রেসে অধিকাংশ (১,০৪,৪২১জন) পার্টি সদস্যের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ৪৪২জন প্রতিনিধি যোগ

দিয়েছিলেন যদিও ১৯৬৪ সাল জুড়েই পার্টির বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বকে গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। এবং পার্টি কংগ্রেসের পরের দুই মাসের মধ্যে দেড় হাজারের বেশি কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে দেড় বছর জেলে রাখা হয়। এই বছর সংশোধনবাদীরা তাদের বম্বে কংগ্রেসে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

একথা মনে রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতানৈক্য শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীগত মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ বা ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষের বিষয়গুলিকে আমাদের পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণের মুখ্য বা অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করার কোনো অবকাশ নেই।

১৯৬৫ – এই বছরে অনুষ্ঠিত কেরালা বিধানসভা মধ্যবর্তী নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি ও কাস্তে-ধানের শিষ প্রতীক দিতে অস্বীকার করলে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও কাস্তে-হাতুড়ি-তারা যথাক্রমে নাম ও প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করি। আমাদের নেতৃত্বের বৃহৎ অংশ জেলের অভ্যন্তরে থাকলেও সি পি আই (এম) ৪৫টি এবং সি পি আই মাত্র ৩টি আসনে জয়যুক্ত হয়। আমাদের পার্টি লাইন যে সঠিক, ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে তা প্রমাণ হয়ে যায়।

১৯৬৮ – ১৯৬৪ সালে কর্মসূচী গ্রহণের সময় সপ্তম কংগ্রেসে মতাদর্শগত দলিল গ্রহণ করা যায়নি। সপ্তম কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে 'ধীরস্থিরভাবে' মতাদর্শগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা সংগঠিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামে মতাদর্শগত প্রস্তাব গৃহীত হয়, যা দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ ও বামপন্থী সুবিধাবাদের বিপরীতে আমাদের স্বাধীন মতাদর্শগত অবস্থান নিতে পথ দেখায়।

১৯৭২ – ১৯৭২ সালে মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত নবম কংগ্রেসে ভারতে জাতি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি পার্টি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৯২ – এই বছর ৩-৯ জানুয়ারি, মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে বড়ো ধরনের বিপর্যয় ও প্রতিবিপ্লবী ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 'কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব' গ্রহণ করে। পাশাপাশি পার্টি কর্মসূচির রণনীতিগত মৌলিক প্রশ্নগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে পরিবর্তনগুলি হিসাব নিকাশ করে কর্মসূচি 'সময়োপযোগী' করার প্রস্তাব নেয়।

২০০০ – একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই তিরুবনন্তপুরমে ২০-২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলনে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে চতুর্দশ কংগ্রেসের নির্দেশ মতো পার্টি কর্মসূচির সময়োপযোগীকরণ সম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালের সম্মেলনে গৃহীত কর্মনীতিটি সময়োপযোগীকরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটিকে দেওয়া হয়। তাই এটি আর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।

২০১২ – কোঝিকোড়ে ৪-৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে চতুর্দশ কংগ্রেসের পরে দুই দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে মতাদর্শগত বিষয়ে বোঝাপড়া আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

(২) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট : বিশ্বের সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহ

(১) কর্মসূচির দ্বিতীয় অধ্যায়ে (সমসাময়িক বিশ্বে সমাজতন্ত্র) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল – 'বিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব জুড়ে বিপুল পরিবর্তন। এই শতাব্দী ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শতাব্দী।' ১৯১৭ সালে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ধারক ভূমিকা চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও কিউবার বিপ্লব, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতি, সমাজতন্ত্রের সাফল্য ইত্যাদির উল্লেখ করার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে গুরুতর ভুলগুলি চিহ্নিত করে বলা হয় – 'ইতিহাস প্রমাণ করেছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এক ধাক্কায় ঘটে না, এটি হবে তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের এক দীর্ঘস্থায়ী পর্ব, এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরও'। (প্যারা ২.১ থেকে ২.৪)

(২) পাশাপাশি একথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কেন 'মানব সমাজের মৌলিক সমাধানে বিশ্ব ধনতন্ত্র অক্ষম' (২.৫) এবং 'পুঁজিবাদের বর্তমান পর্বে ফিন্যান্স পুঁজির কেন্দ্রিভবন ও আন্তর্জাতিকীকরণ নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে' (২.৬), 'সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে আধিপত্য আরও বাড়িয়ে চলেছে' (২.৭) 'একথা সত্য যে বিংশ শতাব্দীর শেষে আন্তর্জাতিক শক্তির পারস্পরিক ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে... এতদসত্ত্বেও পুঁজিবাদ একটি সংকট জর্জরিত ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে অত্যাচার, শোষণ ও অন্যায়েরই ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প।' (২.৮) এই ধারাটিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৪টি প্রধান দ্বন্দ্বের প্রাসঙ্গিকতা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ১৯৯২ সালের চতুর্দশ ও ২০১২ সালে বিংশতিতম কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে নেই। চতুর্দশ কংগ্রেসের কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয় প্রসঙ্গে প্রস্তাবের ভূমিকায় বলা হয়েছিল – 'পরিস্থিতির জটিলতা এবং যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তা মানব সভ্যতার প্রায় এক শতাব্দীর ইতিহাসকে ঘিরে। তার ফলে ব্যাপক, বিস্তৃত, গভীরভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। ঘটনার গতি এবং চরিত্র অনুযায়ী এখন কেবল কয়েকটি প্রাথমিক উপসংহারই টানা যায়' (ওই প্রস্তাবের ১.৪ প্যারা)। এই প্রস্তাবের মূল্যায়নগুলি এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ধরে নিয়েই পরবর্তী দুই দশকের ঘটনাবলি ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বিংশতিতম কংগ্রেসের কয়েকটি মতদর্শগত বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব পার্টির বোঝাপড়াকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রস্তাবে বিশ্বের সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে – 'সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান পর্বে এই উত্তরণ পর্বে সমস্ত মৌলিক বিশ্বজোড়া সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তীব্রতর হবে। ধনতন্ত্রের সময় শ্রম ও পুঁজির মৌলিক দ্বন্দ্ব বর্তমান

সংকট ও মন্দার পরিস্থিতিতে খুবই তীব্র হচ্ছে। আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির শাসকশ্রেণিগুলিকে নিজের প্রভাবের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত হয়। যদিও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে তীব্রতর বিশ্বজোড়া শোষণের পরিস্থিতিতে সেই দ্বন্দ্ব এখন স্তিমিত (মিউটেড)। এই উত্তরণ পর্বের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হিসাবে রয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই। কোনো এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিশ্বের ঘটনাবলির ওপর নির্ভর করে কোনো একটি দ্বন্দ্ব সামনে চলে আসতে পারে। তবে তা কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেই।' (ওই প্রস্তাবের প্যারা ৫.১৩)।

এছাড়াও ওই প্রস্তাবের পরবর্তী প্যারায় (৫.১৪) উল্লেখ করা হয়েছে – 'সাম্প্রতিক সময়ে ধনতন্ত্রের মৌলিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের পরিবেশের অত্যন্ত গুরুতর অবনতি ঘটানোর প্রক্রিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সময় এটা আরও তীব্র হয়েছে... এই প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ার পক্ষে একটি নতুন উপাদানও গতি পেয়েছে।'

(৩) দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক অবস্থা

স্বাধীনতার পর দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক অবস্থার মোকাবিলায় নতুন শাসকশ্রেণির নীতিগুলি তৃতীয় (স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী সময়) এবং চতুর্থ (বৈদেশিক নীতি) অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বৈত চরিত্র, প্রাক্ পুঁজিবাদী সম্পর্ক ছিন্ন না করে, বিদেশি লগ্নিপুঁজির ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী বিকাশের দেউলিয়া পথ এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৯০-এর দশকে সংকট মোকাবিলায় নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পথে যাত্রা ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলেছিল সেগুলি ৩.১ থেকে ৩.১৪ প্যারাগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর ৩.১৫ থেকে ৩.২৪ প্যারাগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে এবং ৩.২৪ থেকে ৩.২৭ প্যারাগুলিতে সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নীতিগুলির ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেশের এই অভ্যন্তরীণ নীতিগুলি কীভাবে বিদেশনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে তা চতুর্থ অধ্যায়ে ৪.১ থেকে ৪.৬ প্যারায় বলা হয়েছে। এখন এগুলির পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণে যাওয়া যেতে পারে।

শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে

প্রথমত, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মহিলা, ছাত্র, যুবসহ ভারতীয় জনগণের বিপুল অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সংগ্রামকে সফল করে তুলেছিলেন। তাঁদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল জমি, খাদ্য, ন্যায্য মজুরি, শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক বিভাজন মুক্ত গণতান্ত্রিক কাঠামোর জীবনমুখী সংস্কৃতির আকাঙ্ক্ষাপূরণ। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিক-কৃষকসহ

এইসব অংশের হাতে ছিল না। তা ছিল বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়াদের হাতে। বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্ব জমিদারতন্ত্র উচ্ছেদ করে, কৃষকের হাতে জমি দিয়ে, দেশের মধ্যে শিল্পপণ্যের বাজার তৈরি করে, বিদেশি পুঁজির আধিপত্য থেকে শিল্পকে মুক্ত করে দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে স্বনির্ভর শিল্পোন্নত ভারত গড়ে তোলার পরিবর্তে দেশের পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য কৃষকের পরিবর্তে জমিদারদের সঙ্গে মৈত্রীর পথ নিল। কারণ তাদের ভয় ছিল এসব করলে দেশের সদ্য স্বাধীন জনগণের যে বিপুল উৎসাহ ও উত্থান ঘটবে তাতে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই তারা এমন এক পুঁজিবাদী বিকাশের পথ নিল যা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উপযোগী। (প্যারা ৩.১/৩.২/৩.৩)

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতে বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্ব, তাদের দ্বৈত চরিত্রের জন্যই, রাষ্ট্রের ওপর তাদের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করল একদিকে জনগণের ওপর আক্রমণের জন্য, অপরদিকে চাপ, দরকষাকষি ও সমঝোতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও ভূস্বামীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব-বিরোধ সমাধানের জন্য। (৩.৪)

তৃতীয়ত, নিজেদের অবস্থানকে জোরদার করতে তারা দুই শিবিরের অস্তিত্বকে দর কষাকষির সুযোগ হিসাবে কাজে লাগায়। কারণ, বৃহৎ শিল্প বা বড়ো মাপের প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি এদের হাতে ছিল না। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্পে সোভিয়েত সাহায্য, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, তেল, কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছিল। এছাড়া গবেষণা, উন্নয়নের (আর অ্যান্ড ডি) ওপর জোর, নতুন পেটেন্ট আইন, বিদেশি পণ্য ও পুঁজির অনুপ্রবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য রক্ষাকবচ ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে শিল্পায়নের স্বাধীন ভিত্তিস্থাপনে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এসবই হলো বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক সাহায্যসহ সমগ্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্কের ঋণ, জনগণের ওপর করের বোঝা, কর ফাঁকি দেওয়া বিপুল পরিমাণ কালো টাকা, সম্পদের কেন্দ্রিভবন, একচেটিয়া ব্যবসার প্রসার বৃহৎ বুর্জোয়াদের সম্পদ এবং রাষ্ট্রের ও সরকারের ওপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল (এটা সংশোধনবাদীদের মত অনুযায়ী ‘সমাজতন্ত্রের দিকে জয়যাত্রা’ নয়)। (প্যারা ৩.৫ থেকে ৩.৮)

চতুর্থত, ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের এই দেউলিয়া পথ সঙ্কট জর্জরিত হয়ে পড়ল। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ল আর্থিক ও বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ও গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার শর্তাবলি মেনে নিল কংগ্রেস সরকার। দেশের আর্থিক সার্বভৌমত্বের অবক্ষয় ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির চাপে উদারনীতি ও বেসরকারীকরণের পথে যাত্রা শুরু হলো। যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা স্বাধীনতার পর মূলধনের ভিত্তি দুর্বল থাকায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিল, কালক্রমে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় হৃষ্টপুষ্ট হয়ে, বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও বিমা, তেল, টেলিকমসহ রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্র দখল করতে নেমে পড়ল। ২২টি একচেটিয়া গোষ্ঠীর সম্পদ ১৯৫৭ থেকে ১৯৯৭-এর মধ্যে ৫০০ গুণ বৃদ্ধি

পেল। বিলগ্নিকরণের ফলে সস্তায় শেয়ার কিনে লুট ও দুর্নীতির রাস্তা খুলে গেল। ভারতীয় কোম্পানি এখন বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা কিনছে। উদার আমদানির ফলে কারখানা বন্ধ। কর্মচ্যুতি ও বেকারি বাড়ল। কেবল সুদ মেটাতে রাজস্ব ব্যয়ের এক বিরাট অংশ চলে যাওয়ায় উন্নয়ন ও দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচীগুলি মার খেল। শ্রমিকদের অধিকার আক্রান্ত। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী নিয়োগ, ক্রমবর্ধমান বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের শোচনীয় অবস্থা, উদ্বৃত্ত মূল্যের লুণ্ঠন ও মুনাফার পাহাড় বানাচ্ছে। এই পর্বে পুঁজিবাদী বিকাশের এই সর্বনাশা পথে যাত্রার অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হলো স্বাধীনতার পর শাসকশ্রেণীর অনুসৃত দেউলিয়া নীতি এবং বাইরের কারণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়, যা এই নীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করেছিল। এই পর্বে 'যদিও অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু অংশ বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় রাজি বলে মনে হচ্ছে, মাঝারি ও ছোটো পুঁজিপতিদের বিরাট অংশই উদারনীতির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত' হচ্ছেন। (প্যারা ৩.৯ থেকে ৩.১৪)

কৃষিক্ষেত্র

প্রথমত, 'কৃষি সমস্যা ভারতের জনগণের সামনে সর্বপ্রধান জাতীয় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে।' (৩.১৫) বাম সরকারগুলিই কেবল চালু আইনে ভূমিসংস্কার রূপায়ণ করেছে। দেশে জমির কেন্দ্রিভবন বাড়ছে, ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে, গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতার বিপুল অংশ সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। 'কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ যদিও স্পষ্টই সর্বভারতীয় প্রবণতা, বহুতর আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে কৃষি সম্পর্ক চিহ্নিত' 'ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ পুরানো সম্পর্ক দৃঢ়তার সঙ্গে ভেঙে দিয়ে হয়নি, প্রাক্ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠনের এক বদ্ধ জলার ওপরই তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ব্যবস্থার বিকাশ হয়েছে সেকেলে ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে।' আধাসামন্ততান্ত্রিক জমিদারকে ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরিত করে, ধনী কৃষকদের একটি স্তর গড়ে তুলে, সরকারি বরাদ্দ ও ঋণ এদের পাইয়ে দিয়ে, উচ্চফলনশীল বীজ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশ ১৯৬০-র শেষ দিক থেকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করলেও গ্রামাঞ্চলে অপুষ্টি, অনাহার, দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়েছে। জমিদার-ধনী কৃষক-ঠিকাদার-ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী আঁতাত গড়ে উঠেছে বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলে সর্বক্ষেত্রে আধিপত্যকারী শ্রেণি হিসাবে। (প্যারা ৩.১৬ থেকে ৩.২১)

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সহায়তায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের দম যখন বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফুরিয়ে গেল তখন কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের নীতি বিপজ্জনক মোড় নিল। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কমিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রজুড়ে দেশি বিদেশি কর্পোরেট ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশ বাড়ছে। জমি, জল, সার, বীজ, কৃষিপণ্যের বাজার, গবেষণা, দেশের জৈব সম্পদ – ইত্যাদি একের পর এক ক্ষেত্রে এই অনুপ্রবেশ ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সংকট তৈরি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাহিদা মেটাতে জমির ব্যবহার ও চাষের ধরন পরিবর্তনের ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের

সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাড়ার পাশাপাশি একদিকে জমিদার, ধনতান্ত্রিক কৃষক, ধনী কৃষক ও তার সহযোগীদের নিয়ে গ্রামের ধনীরা, অন্যদিকে গ্রামের গরিব মূলত খেতমজুর, গরিব কৃষক, গ্রামীণ কারিগরসহ বিপুল কৃষক সমাজ, এই দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। (প্যারা ৩.২২ থেকে ৩.২৪)

অন্যান্য ক্ষেত্রে – আমলাতন্ত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল জাতি-গোষ্ঠী ভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রভাব পড়ছে ভারতেও। বহুজাতিক প্রচারমাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, অবক্ষয়ী মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বাস্তবে পরিত্যক্ত হয়েছে (প্যারা ৩.২৫ থেকে ৩.২৭)।

বৈদেশিক নীতি

যে কোনো রাষ্ট্র ও সরকারের বৈদেশিক নীতি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন ব্যতীত কিছুই নয়। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি শাসক বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধিতা ও সমঝোতা তথা সহযোগিতার দ্বৈত চরিত্রের প্রতিফলন। এগুলি মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ তোষণের নীতি হলো প্রথম পর্ব। তারপর জোটনিরপেক্ষতা, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ও ১৯৭১ সালের ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি হলো দ্বিতীয় পর্ব (ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যার সময়টা ছাড়া)। তৃতীয় পর্ব শুরু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে – সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও উদারনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চাকা উলটোদিকে ঘোরানোর পর্ব। ১৯৯৮-তে বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকার আসায় সাম্রাজ্যবাদমুখী প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়। বৈদেশিক নীতির জোটনিরপেক্ষ ভিত্তি ও অভিমুখ বজায় রাখার জন্য সংগ্রামই ভারতের স্বাধীন ভূমিকা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে (প্যারা ৪.১ থেকে ৪.৬)।

(৪) রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিপ্লবী লক্ষ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগের একটি মূল প্রশ্ন হলো ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র কী? অর্থাৎ কোন শ্রেণীগুলির হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা রয়েছে? পার্টি কর্মসূচির পঞ্চম অধ্যায়ের (রাষ্ট্রকাঠামো ও গণতন্ত্র) শুরুতেই ৫.১ প্যারায় তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এর মূল কথাগুলি হলো –

প্রথমত, বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া ও জমিদারদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র। অর্থাৎ বুর্জোয়া ও জমিদারদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু এই বুর্জোয়া-জমিদার জোটের নেতৃত্বে রয়েছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা।

দ্বিতীয়ত, ওদের লক্ষ্য কী ? ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশ।

তৃতীয়ত, জমিদারদের রাষ্ট্রক্ষমতায় রেখে, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ না করে কীভাবে ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশ সম্ভব ? বৃহৎ বুর্জোয়ারা পূর্বে বর্ণিত তাদের দ্বৈত চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের জন্যই ক্রমে বেশি বেশি করে বিদেশি লগ্নিপুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করছে আপস, চাপ ও দরকষাকষি ইত্যাদির মাধ্যমে জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার জন্য। কাজেই সি পি আই-এর মূল্যায়ন মতো এটা জাতীয় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র নয়।

চতুর্থত, এটা স্পষ্ট – সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিদেশি লগ্নিপুঁজির সম্পর্ক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয়। তাছাড়া এরা দালাল বা মুৎসুদ্দি (নকশালপন্থী মতে) নয়, আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াও নয়। কিন্তু জমিদারদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের আঁতাত রাজনৈতিক, কারণ তারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার। উদারনীতির যুগে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে অবৃহৎ/জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে হলেও হ্রাস পাওয়ার বিষয়টিও মনে রাখতে হবে।

পঞ্চমত, বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী নয়। একচেটিয়া পুঁজি কথাটি যেভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি তা লেনিন যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। কিছু কিছু বামপন্থী পাতি বুর্জোয়া পার্টি ভুল করে সেইভাবে ব্যাখ্যার ভিত্তিতে উন্নত পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মতো ভারতেও এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়ে থাকেন।

পার্টি কর্মসূচীর পঞ্চম অধ্যায় রাষ্ট্র কাঠামো ও গণতন্ত্র সম্পর্কে বাকি ধারাগুলি (৫.২ থেকে ৫.২৩) নজরের বাইরে থাকা উচিত নয়। যেমন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক (৫.২, ৫.৩), উত্তর পূর্বাঞ্চল ও জম্মু কাশ্মীর সমস্যা (৫.৪, ৫.৫), আদিবাসী প্রশ্ন (৫.৬), ধর্মনিরপেক্ষতার সামনে চ্যালেঞ্জ (৫.৭, ৫.৮), সংখ্যালঘু প্রশ্ন (৫.৯), জাতি নিপীড়ন ইত্যাদি (৫.১০-৫.১২), নারী সমস্যা (৫.১৩), আমলাতন্ত্র, বিচার-বিভাগ, সামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনী (৫.১৪-৫.১৬), সংসদীয় গণতন্ত্র (৫.১৭-৫.১৮), স্থানীয় সংস্থা (৫.১৯), সংস্কৃতি (৫.২০) ও কালো টাকা, রাজনীতির দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন (৫.২১)। এইসব খণ্ড খণ্ড সমস্যাগুলি বাদ দিয়ে ভারতে রাষ্ট্র কাঠামো ও গণতন্ত্র নিয়ে বোঝাপড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(৫) মূল দ্বন্দ্বসমূহ

আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বের সমসাময়িক সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ করে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্বগুলি চিহ্নিত না করে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করা যায় না। এগুলি হলো –

প্রথমত, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এটিই হলো ভারতীয় পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব, কারণ এই দ্বন্দ্ব সমাধান না হলে অন্য দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতা বাড়বে, সমাধান তো দূরের

কথা। আবার এই দ্বন্দ্বটির সমাধান হলে বাকি দ্বন্দ্বগুলির অস্তিত্ব থাকবে না। কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব। তা হলে সমাজতান্ত্রিক ভারতের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বটি অবশ্যই বিশ্বের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। ভারতীয় বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব অপরিবর্তিত থাকবে কারণ বিপ্লবের বর্তমান স্তরে তার সমাধান হবে না।

দ্বিতীয়ত, জমিদার ও কৃষক সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এটিই হলো দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু কারণ জমিদারদের শ্রেণীগতভাবে উচ্ছেদের জন্য আমূল ভূমিসংস্কার না করে দেশের জনগণের সামনে সর্বপ্রধান জাতীয় সমস্যা হিসাবে কৃষি সমস্যার সমাধান অসম্ভব। প্রধান দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা যখন সবচাইতে সামনে চলে আসে ও তাৎক্ষণিক সমাধান দাবি করে তাকেই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় এবং তা বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন হয়।

তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব। স্বাধীনতার আগে এটিই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বটির সমাধান হয়নি, কারণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের আপসের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। দেশের শাসকশ্রেণির নেতৃত্বে আসীন বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশি লগ্নিপুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতায় লিপ্ত হওয়ায় এই দ্বন্দ্বটির তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তর্কের খাতিরে বলা যায় দেশে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক হস্তক্ষেপে স্বাধীনতা আক্রান্ত না হলে এটি দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া অসম্ভব।

(৬) বিপ্লবের স্তর

ভারতীয় বিপ্লবের স্তর তিনটি –

(ক) জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের স্তর (১.৭ প্যারার শেষ বাক্য)। এই স্তর হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংযুক্ত মোর্চার স্তর। এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সহযোগী দেশের সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীসহ সমস্ত স্তরের ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই মুখ্য কাজ। স্বাধীনতার পর সেই স্তর অতিক্রান্ত হয়ে ভারতীয় বিপ্লব নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যেহেতু এই ফ্রন্টের নেতৃত্ব ছিল বৃহৎ বুর্জোয়াদের হাতে (ভিয়েতনামের মতো শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের হাতে নয়), সেহেতু আপসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী কর্তব্যগুলি বিপ্লবের এই স্তরে সম্পন্ন হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়ারা এই কাজ কোথাও করেনি। ১৯৪৮ সালে, এমনকি ১৯৫১ সালের গৃহীত কর্মসূচীতে যেহেতু স্বাধীনতাকে আনুষ্ঠানিক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের মিত্র বলে ধরে নিয়ে বিপ্লবের প্রথম স্তরটি অতিক্রান্ত হয়নি বলেই কার্যত ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে নকশালপন্থীরা যেহেতু ভারতীয় বুর্জোয়াদের 'মুৎসুদ্দি' বলে চিহ্নিত করেছিল সেহেতু তারাও ভারতীয় বিপ্লব ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ করত, যদিও একেবারে বিপরীত দিক থেকে।

(খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর – স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন বুর্জোয়া জমিদার জোটের নেতৃত্ব বৃহৎ বুর্জোয়াদের হাতে থাকার

কারণে জমিদার বনাম কৃষকের দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ বনাম ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়নি। এগুলি বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি বুর্জোয়ারা যেহেতু বিংশ শতাব্দীর আগের মতো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে অক্ষম সেহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তার মিত্রদের গণতান্ত্রিক মোর্চাকেই পালন করতে হবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা বুর্জোয়ারাই পরিত্যাগ করেছে, সেই ভুলুণ্ঠিত পতাকা শ্রমিকশ্রেণিকেই তুলে ধরতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিত্যক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার স্তরকে তাই জণগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং কৃষি বিপ্লবই তার অক্ষস্বরূপ বলে বলা হয়। সি পি আই-এর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী হলো তাদের কথামতো বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আসীন জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এটা শ্রেণি সহযোগিতার লাইন, এ বিষয়ে বাস্তবে কোনো সন্দেহ নেই। অপরপক্ষে বাম হঠকারিদের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বক্তব্য হলো – হুবহু চীন বিপ্লবের স্তরকে অনুকরণ করা, কারণ প্রাক্ বিপ্লব চীনের মতো ভারতেও নাকি সাম্রাজ্যবাদের দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, যাঁরা বর্তমান বিপ্লবের স্তরকে সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করেন তাঁরা ভারতকে একটি পুরোপুরি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে মনে করেন, সেখানে সামন্ততন্ত্রের কোনো অবশেষ নেই এবং এখানে পুঁজিবাদ এতটাই বিকশিত হয়েছে, যাতে তাকে সাম্রাজ্যবাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা যায়। (বিপ্লবের বর্তমান স্তর কেন জনগণতান্ত্রিক, তা পার্টি কর্মসূচির ১.১১, ৬.১, ৬.২, ৭.১, ৭.৩ প্যারাতে উল্লেখ করা হয়েছে)।

(গ) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর : ওপরের ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, জণগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম না করে এক লাফে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছোনোর কোনো অবকাশ নেই। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে ভারতীয় বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে (প্যারা ৬.২)।

(৭) প্রধান শত্রু

রণনীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে সর্বহারা কার বিরুদ্ধে মূল আঘাত হানবে, তা স্থির করা এবং একাজে কীভাবে সমাবেশ ঘটিয়ে (মূল ও পরবর্তী মজুত বাহিনী) এ লড়াই পরিচালনা করবে তার পরিকল্পনা রচনাই হলো রণনীতি। পার্টি কর্মসূচীতে বিপ্লবের স্তর (জনগণতান্ত্রিক) নির্দিষ্ট করার পাশাপাশি এই স্তরে কার বিরুদ্ধে প্রধান আঘাত হানতে হবে (প্রধান শত্রু) তা ৭.৪ এবং ৭.১০ প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক নয়, সেহেতু সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণিকে আঘাত করার প্রশ্ন ওঠে না। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র ব্যাখ্যায়ও বলা হয়েছে, বৃহৎ বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের। তারাই জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করে নিয়েছে এবং বিদেশি লগ্নিপুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে গাঁটছড়া বাঁধছে। কাজেই বৃহৎ পুঁজিপতি, জমিদার ও বিদেশি লগ্নিপুঁজিই হলো বিপ্লবের বর্তমান স্তরে প্রধান শত্রু।

(৮) বিপ্লবের নেতৃত্ব, মিত্রবাহিনী ও তার বিন্যাস : জনগণতান্ত্রিক মোর্চা

(ক) বিপ্লবের নেতৃত্ব : কেন শ্রমিকশ্রেণীই কেবল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে তা ৭.১, ৭.২ ও ৭.৫ ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(খ) বিপ্লবের মিত্রবাহিনী ও তার বিন্যাস :

প্রথমত, শ্রমিক-কৃষক দৃঢ় মৈত্রীই হলো জনগণতান্ত্রিক মোর্চার মূল শক্তি ও ভিত্তিস্বরূপ। মুখ্যত এর শক্তি ও দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে অন্যান্য শ্রেণীগুলির ভূমিকা কী হবে (প্যারা ৭.৬)।

দ্বিতীয়ত, খেতমজুর এবং গরিব কৃষক হবে শ্রমিকশ্রেণীর মূল মিত্র (প্যারা ৭.৭)।

তৃতীয়ত, মাঝারি কৃষক হবে আস্থাভাজন মিত্র এবং তার আস্থা পেতেই হবে (প্যারা ৭.৭)।

চতুর্থত, ধনী কৃষক সম্পর্কে ৭.৮ ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো কোনো সময়সন্ধিক্ষণে তাদেরও জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় নিয়ে আসা যায় এবং তাদের দোদুল্যমান চরিত্র সত্ত্বেও তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ভূমিকা পালন করতে পারে।'

পঞ্চমত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও বিভাজন সত্ত্বেও তারা জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শরিক হতে পারে এবং হবেও। কাজেই এরা দোদুল্যমান মিত্র এবং বিপ্লবের পক্ষে তাদের নিয়ে আসার জন্য সমস্ত প্রয়াস চালাতে হবে (প্যারা ৭.৯)।

ষষ্ঠত, অবৃহৎ বুর্জোয়া – এরা রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে বিরোধিতার পথে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু এদের দোদুল্যমান ও অস্থিতিশীলতার জন্য জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় এদের যোগদান যেসব বিষয়গুলির ওপর নির্ভরশীলতা তা ৭.১১ ধারায় ব্যাখ্যা করেও ৭.১২ ধারায় এদের মোর্চায় নিয়ে আসার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে হবে বলা হয়েছে।

(৯) বিপ্লবের কাজ : জনগণতন্ত্র ও তার কর্মসূচী

এগুলি বিশদভাবে কর্মসূচীর ষষ্ঠ অধ্যায়ে (জনগণতন্ত্র ও তার কর্মসূচী) বলা হয়েছে। এখানে কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে :

(ক) প্রধান কাজ হলো, বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের পরিবর্তে (Replace করে) শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা সমাজতন্ত্রের পথে যাবার ভিত্তি প্রস্তুত করবে (প্যারা ৬.২)।

(খ) রাষ্ট্র কাঠামোর ক্ষেত্রে করণীয় কাজ (প্যারা ৬.৩)।

*প্রকৃত সমতা ও স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশের জন্য কাজ। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও তালিকার ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই হবেন সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারি। কেন্দ্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা, কিন্তু রাজ্যে কোনো উচ্চ কক্ষ (বিধান পরিষদ), কেন্দ্র নিযুক্ত রাজ্যপাল থাকবে না। উপজাতি ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর এলাকায় রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন। পর্যাপ্ত মহিলা প্রতিনিধিত্ব। *পূর্ণ নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি, বিনা বিচারে কাউকে আটক

না রাখা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আরাধনা, বক্তৃতা, সংবাদপত্র, সভা সমিতি, রাজনৈতিক দল গঠনের ও বিরোধিতা করার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে। কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্যারান্টি করা হবে। তফসিলী জাতি, আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের প্রতি সবরকম বৈষম্যের অবসান হবে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করা হবে। *মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা, বিনা খরচে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পরিবেশ রক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া নীতি, প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন করা হবে।

(গ) কৃষি ও কৃষক সমস্যার ক্ষেত্রে (প্যারা ৬.৪) – আমূল ভূমিসংস্কার করে জমিদারি ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে খেতমজুর ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বন্টন, জমিদার ও মহাজনি ঋণ বাতিল, স্বল্পসুদে ঋণ ও ফসলের ন্যায্য মূল্য, সেচ, বিদ্যুৎ, উন্নত প্রযুক্তি ও বীজ, স্বেচ্ছামূলক সমবায় ও সুসংহত গণবন্টন ব্যবস্থা।

(ঘ) অর্থনীতি : শিল্প ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে * বহুকাঠামো সম্পন্ন অর্থনীতি, মালিকানার বিভিন্ন রূপ, মূল ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা ও সরকারের মূল ভূমিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী ও নির্দেশাত্মক ভূমিকা * শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক ও পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতীয় ও বিদেশি সম্পদের কেন্দ্রিভবন ভেঙে দেওয়া, অধিগ্রহণসহ অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান। নির্বাচিত ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। ফিনান্স পুঁজি চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে সাহায্য দেওয়া হবে।* শ্রমিকদের স্বার্থে উপযুক্ত মজুরি, কাজের ঘণ্টা হ্রাস, সামাজিক বিমা, আবাসন, গোপন ব্যালটে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি, পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও ধর্মঘটের অধিকার (প্যারা ৬.৫, ৬.৭)।

(ঙ) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে (প্যারা ৬.৭) – জোটনিরপেক্ষতার পুনরুজ্জীবন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পক্ষে সমস্ত সংগ্রামকে সমর্থন, প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক উন্নত করা হবে।

(১০) কয়েকটি রণকৌশলগত প্রশ্ন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭.১৩ থেকে ৭.১৮ ধারাগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিচার করেই পার্টি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলির কোনোটিকেই খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই। ৭.১৭ ধারা এবং ৭.১৮ ধারার প্রতিটি বাক্যই আলাদা করে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(১১) কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলার কাজ

একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকলেও বিপ্লব সম্ভব নয়। পার্টি কর্মসূচীর অষ্টম অধ্যায়ে সেইরকম একটি পার্টি গড়ে তোলার কাজে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং পার্টির মতাদর্শ, লক্ষ্য ও মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারা

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন।

সমাজ কি করে তৈরি হয়? সভ্যতা কি?

সমাজ বিকাশের ইতিহাস হলো শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। ভারতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট আছে। ইতিহাস তৈরি করে মানুষ। কোনো বীর নয়। মার্কসবাদীদের মতে সমাজের পরিবর্তনের রূপ হলো

আদিম সাম্যবাদ → দাস সমাজ → সামন্ততন্ত্র → পুঁজিবাদ → সমাজতন্ত্র

ভারতের বৈশিষ্ট্য হলো প্রাচীন যুগ + ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (ঔপনিবেশিক শাসনসহ) +পুঁজিবাদ

মার্কস বলেছিলেন, দুটো সমাজ ব্যবস্থাই কেবল পৃথিবীতে একইরকম—প্রাচীন সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ। কিন্তু ভারতে প্রাচীন সাম্যতন্ত্র কখন ছিল তা স্পষ্ট নয়।

ইউরোপে যুগ বিভাগ যেভাবে হয়েছে ভারতে যুগ বিভাগ ওভাবে হবে না। প্রাচীন যুগ অনেক দীর্ঘ। ইতিহাস লেখা হয় মতাদর্শের ভিত্তিতে। ভারতের ক্ষেত্রে (১) (ক) ঔপনিবেশিক ইতিহাস, (খ) উগ্র জাতীয়তাবাদী ইতিহাস, (৩) সাব-অলটার্নস ইতিহাস, (৪) মার্কসবাদী ইতিহাস বেশি দেখা যায়।

1. Scope of the Subject

(১) ভারতের সঙ্গে ইউরোপ মেলে না

(২) ভারতের ক্ষেত্রে জাতপাত unique

(৩) বহুভাষা, বহু ধর্ম, বহু জাতির দেশ

(৪) উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

(৫) দর্শনের কোনো পরিবর্তন নেই

(৬) ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ভুল ইতিহাস

সুতরাং রণনীতি ও রণকৌশল দেশের মত করেই ঠিক করতে হবে।

‘‘ভারতবর্ষ‘‘ এর সংজ্ঞা

ভরত বংশ থেকে নাম ভারত। বর্ষ মানে উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। ১৯৪৭-এর পর শুধু ভারত।

উচ্চারণ করতে পারত না। তাই সিন্ধু হয়ে গেল হিন্দু আর স্থানের নাম হিন্দুস্থান। গ্রীকরা বলত Ind বা Indus সেখান থেকে India।

ইতিহাসকে **দু’ভাগে** ভাগ করা হয়।

১। ঐতিহাসিক যুগ ২। প্রাগৈতিহাসিক যুগ। লিখিত লিপি থাকলে তবেই ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়।

ভারতে ঐতিহাসিক যুগের শুরু বেদের সময়কাল থেকে।

নতুন আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে হয়। ১৯২১ সালে হরপ্পা আবিষ্কার।

ভারতে ৫ হাজার বছরের সভ্যতার ধারাবাহিকতা আছে।

৩। ভারতের সভ্যতা প্রায় ৫০০০ বছরের। শুরুর সময় খ্রীঃপূঃ ৩০০০ সাল। প্রাচীন যুগ প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে চলে। খুবই দীর্ঘ। একে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) হরপ্পা সভ্যতা খ্রীঃপূঃ ৩০০০-১৫০০

(খ) বৈদিক যুগ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ -৫০০

(গ) সামন্ততন্ত্রের উত্তরণের যুগ বা ব্রাহ্মণ্য সমাজ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ থেকে ৫০০খ্রীঃ

ভারত শাসন করার জন্য কোম্পানির কর্মী ও অফিসারের ভারতীয়দের প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন হয়। এজন্য সংস্কৃত, ফার্সি, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা জানতে হতো। এরা ধর্মশাস্ত্রকেও আইন মনে করে পড়েছিলেন। অথচ ধর্মশাস্ত্রগুলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নেতাদের স্বার্থে একতরফাভাবে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কাজ চালু রাখার জন্য রচনা করা হয়েছিল। ওরিয়েন্টালিস্ট ঐতিহাসিকদের সংস্কৃত ছাড়া অন্যভাষা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। কাজেই তারা ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এমনকি ধর্মশাস্ত্র নির্ভর করেই জাতিভেদ প্রথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর ভিত্তি করেই তারা ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন, এমনকি ইসলাম ধর্মের অবদানকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ব্রাহ্মণরা ছিলেন তৎকালীন সমাজের কর্তৃত্বকারী ও দার্শনিক, সুতরাং তাদের লেখা পক্ষপাতদুষ্ট হবেই। পরবর্তীকালে শিলালিপি, ব্রাহ্মীলিপি ও পলিভাষায় লেখা বৌদ্ধশাস্ত্র, মুদ্র, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে (গ্রীক, লাতিন, চীনা ও আরবি ভাষায় লেখা) ইতিহাস জানা যায়। জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায় তা প্রাকৃত ভাষায় লেখা ছিল।

জেমস মিল প্রথম ভারতকে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও ইংরেজ যুগ এইভাবে ভাগ

করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা ভাগ করেছেন ইউরোপের মত প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ তবে ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার বলেছিলেন ইউরোপের যুগ বিভাগ শ্রেণী সমাজকে চিহ্নিত করেছে, যেমন প্রাচীন যুগ মানে দাস সমাজ, মধ্য যুগ মানে সামন্ততন্ত্র, আধুনিক যুগ অর্থ পুঁজিবাদ। কিন্তু ভারতে তা সম্ভব নয়। কারণ ভারতে চিরায়ত অর্থে দাস প্রথা ছিল না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ সাল থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ সাল। সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৭০০।

প্রথম নগর সভ্যতা – হরপ্পা নগর না থাকলে সভ্যতা বলা যায় না। নগর মানেই রাষ্ট্র। তার অর্থ শ্রেণী থাকছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। দাস থাকলেও থাকতে পারে। পশুপালন ছিল। কৃষিকাজও ছিল। সেচ ছিল। কেন সিন্ধু উপত্যকায় বসতি?

ব্রোঞ্জ যুগ। তামা টিন দিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হতো।

সম্ভবত দাস ছিল।

মাতৃপূজা লিঙ্গ পূজা, অরণ্যে তপস্যা, যোগ, যাদু, চিকিৎসা, লোকায়ত দেবী, মাতৃ প্রাধান্য। এ সবের ধারাবাহিকতা রয়ে গেল।

হরপ্পা সভ্যতা কি আর্যদের তৈরি? ভারতের আদিম অধিবাসী কা্রা?

হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হলো কেন? –

পশুপালক সমাজ, খাদ্য সংগ্রাহক সমাজ এবং খাদ্য উৎপাদক সমাজ এর মধ্যে চীনের প্রাচীর ছিল না, একটা থেকে আর একটার উত্তরণ ঘটত এবং পাশাপাশিও চলত।

বৈদিক যুগ

খ্রীঃপূঃ ১৫০০ সাল থেকে খ্রীঃপূঃ ৫০০ সাল পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের কাল।

ভারত ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র ঋকবেদ। এটা প্রধানত ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা। কয়েকটা পরিবার নিয়ে চিন্তা বলয়। গুরু শিষ্য পরম্পরা। বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগকে বেদান্ত বলা হয়। (আলবেরুণীর সময় খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে বেদ লিখিত রূপ পায়)

ঋক্‌বেদে পাওয়া যায় যৌথ জীবন চর্চা– যজুর্বেদে ভাগাভাগি–চতুর্বর্ণের কথা।

ঋক্‌বেদে আর্য অনার্য সংগ্রামের বিবরণ–অথর্ব বেদে আর্য অনার্যের জীবনচর্চা, আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পারস্পরিক সংমিশ্রণ।

পুরাণের রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপজাতিদের নেতার নামে উপজাতির নাম। ইন্দ্র, কৃষ্ণ কে?

যুদ্ধ, লুঠ, দশ রাজার যুদ্ধ।

ভরত উপজাতির সৃষ্টি ও বিকাশ। ভরত বংশের নাম থেকেই ভারত কথাটির সৃষ্টি। বেদে পরাজিত রাজাদের কথা থাকত। সুদাস প্রথম রাজচক্রবর্তী রাজা।

ঋক্‌বেদীয় সমাজের শ্রমের সামাজিক বিভাজন সম্পত্তির ভেদাভেদের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। সমাজ গঠিত হয়েছিল মূলতঃ জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, কূল ইত্যাদির ভিত্তিতে।

পশুপালক সমাজে একজনের হাতে অনেক পশুপাল চলে এলে কাউকে উত্তরাধিকার সূত্রে দেওয়ার জন্যে প্রত্যেকের একটা পরিচয় দরকার হয়ে পড়ে। **তখনই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হওয়া শুরু হল।** পশুপালক জনগোষ্ঠী বা কৃষিজীবী গোষ্ঠী দাস রাখত। কিন্তু দাসভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি।

বিজিত শ্রেণীর পুরোহিতদের আর্য সমাজে অঙ্গীভূত করে দেওয়া হয়। এই জন্য কৃষ্ণ বর্ণ ঋষিদের দেখা পাওয়া যায়। যেমন কন্ব, অঙ্গীরা, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। আর্য অনার্যের মিশ্রণ ছিল। ঘটোৎকচ, উলুপি, শান্তনু-সত্যবতী।

চতুর্বর্ণের উৎপত্তি আনুমানিক খ্রীঃপূঃ ৮০০ শতকে। ঋকবেদের দশম মণ্ডলে এটি প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে অনেক বৈদিক রচনা মহাভারতে, গীতা ইত্যাদিতে এটি ঢুকে গেছে। অথর্ব বেদের শেষ দিকে বর্ণ বিভাজন (সামাজিক স্তর বিভাজন) হতে থাকে। ঋক্‌বেদের দুটি গায়ের রং-এর দেখা পাওয়া যায়। কালো ও ফর্সা। আর্যরা ছিল ফর্সা, আর দাসরা ছিল কালো।

আর্য পুরোহিত তন্ত্রের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার পুরোহিতদের সংস্কৃতিগত মিশ্রণ হয়। এর মধ্য দিয়ে গিয়ে এক একটি প্রধান গোত্র গড়ে উঠে। আবার প্রত্যেকটা গোত্রের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ছিল প্রত্যেকটি গোত্রকে নিয়ে এক একটি চিন্তন বলয় গড়ে ওঠে।

ঋক্‌বেদীয় মানবগোষ্ঠীর পশুপালক হলেও অল্প সম্পদের অধিকারী ছিল। কিন্তু বেশি মাত্রায় সঞ্চয় করতে পারত না। তাই এখানে সম্পত্তির ভেদাভেদের ভিত্তিতে এই সমাজের শ্রমের সামাজিক বিভাজন হয়নি। গঠিত হয়েছিল মূলত জ্ঞাতিগোষ্ঠী-কূল ইত্যাদির ভিত্তিতে।

মানুষকে সহজ ভাষায় দেবত্বের মহিমা বোঝানোর জন্য ভাগবৎ পাঠ, আদিবাসীদের শূদ্রায়ণ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা। বাংলার ও ওড়িশার কিছু মানুষকে ব্রাহ্মণত্বে প্রমোশন দেওয়া হয়। এদের বলা হতো মার্জার ব্রাহ্মণ।

তন্ত্রের ইতিহাস বহু প্রাচীন। যাদু বা লোকায়ত, তন্ত্রমন্ত্র সাধু, যোগী, অরণ্যবাসী সাধু, সবই হরপ্পা সভ্যতার আমলে। পরে আর্যদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে অথর্ববেদ তৈরি হয়। তান্ত্রিক ধারায় যে কৃষ্ণ ষটকর্ম অর্থাৎ মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ ও স্বস্ত্যয়ন। আছে অথর্ব বেদের Black Magic এর মধ্যে। তন্ত্র যে কোথায় কবে আবির্ভূত হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তন্ত্রে যে রকম দেবীপূজার প্রাধান্য আছে বৈদিক ধর্মে তা নেই। অনেকের মতে মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় সমাজের থেকে উদ্ভূত। আবার মহেঞ্জোদড়োর হরপ্পার মাতৃমূর্তি থেকে মনে করা হয় যে তন্ত্র সম্ভবত প্রাক্‌ বৈদিক কোনো ধর্ম। এই ধর্মাচার বৈদিক সময়ের অগ্রগতির সময় অনার্যদের মধ্যে চর্চিত হত।

পরবর্তীকালে এদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তাতে সমাজ ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণীগুলি গড়ে ওঠে। আর্য ও দাস – এই দুই সামাজিক শ্রেণী তৈরি হয়ে যায়। তবে পশুপালনের তুলনায় কৃষিজীবীদের মধ্যে দাসপ্রথা বেশি প্রচলিত হয়েছিল।

রামায়ণ বা মহাভারতের কোনো যুদ্ধ কোনো সময় হয়নি। কিন্তু এতে লেখকদের সমসাময়িক যুগের দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতির প্রতিফলন আছে।

বেদের যুগে খাদ্যাভাব ছিল। যাযাবর চরিত্রের পশুপালক আর্যদের জীবনযাত্রা কঠোর ও শ্রমসাধ্য ছিল। প্রয়োজনের অনুপাতে খাদ্য পর্যাপ্ত পেত না। এইজন্য বেদে শুধু খাদ্যের

জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তখন খাদ্যের উৎস ছিল শিকার করা পশুপাখির মাংস, বনের ফলমূল এবং প্রাক্ আর্যদের সম্পত্তির লুঠপাট, এক চারণভূমি থেকে আরেক চারণভূমিতে যাওয়া, দুধ ও মাংসের টান পড়লে অন্য চারণভূমির সন্ধানে যাওয়া।

উৎপাদন ব্যবস্থা এমন স্তরে ছিল না যে সাধারণ মানুষের সারা বছর খাদ্য জোটাতে পারা যাবে। কৃষিকাজ একটু আধটু জানলেও যেহেতু লোহার ব্যবহার জানা ছিল না, ব্রোঞ্জের হালে চাষ বেশি করা যেত না।

দাসপ্রথা

ইউরোপে ছিল দাসসমাজ। দাসদের উৎপাদনের ওপরেই সমাজকে নির্ভর করতে হত। দাস ও মালিক দুই মেরুতে অবস্থান করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আমেরিকাতেও দাসপ্রথা ছিল। আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস করা হত। ভারতে বিদেশী আক্রমণকারীরা এসে লুঠপাট করে নিয়ে যাওয়ার সময় মানুষও ধরে নিয়ে যেত ও দাস বানাতো। ঋক্‌বেদে আর্যরা আসার আগে স্থানীয় মানুষদের দাস বলে উল্লেখ করা আছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে দাস মানে দাতা। ঋক্‌বেদে অনেক সময় দাসদের দু পেয়ে পশু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতে দাস সমাজ ছিল না। দাস ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল।

ভারতে গ্রিস বা রোমের মতো দাসরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল না। ব্যক্তিগত দাস ছিল, গৃহপালিত দাসদের চাষে বা শহরের হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। এরা স্বাধীন পরিবারের পাশাপাশি সহবস্থান করতো। গ্রীস বা রোমের মতো রাক্ষুসে চেহারার খামারে দাসশ্রম লাগিয়ে উৎপাদন করা হতো না। দাস শ্রমের ভূমিকা প্রান্তিক থাকলেও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা দাসশ্রমের গুরুত্ব বারবার তুলে ধরেছেন।

ভারতে যে ক'ধরনের দাসেদের কথা জানা যায় –

(১) যারা প্রভুর ঘরে জন্মেছে, (২) যাদের কেনা হয়েছে, (৩) যুদ্ধবন্দী, (৪) ঋণের দায়ে দাস, (৫) দুর্ভিক্ষে দাস, (৬) জরিমানা দিতে অক্ষম ব্যক্তি, (৭) কারারুদ্ধ ব্যক্তি, (৮) উপহার হিসাবে প্রাপ্ত, (৯) বন্ধক দেওয়া হয়েছে, (১০) স্বেচ্ছায় নিজেকে বিক্রি করেছে, (১১) বাজিতে হেরে গিয়ে (যেমন যুধিষ্ঠির।)

সে সময়ে বারবার দুর্ভিক্ষ হত। **ঋকবেদীয় আর্য সমাজের বৈশিষ্ট্য হল সদস্যদের ভিতর তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের অনুপস্থিতি। কারণ কৃষিকাজ শুরু হওয়ার পর পরিবারগুলি নিজেরাই জমিতে চাষ করত। দাসদের দিয়ে চাষ করিয়ে নিজেরা ভোগ করতো এমন নয়। পুরোহিত ও জোতদাররা দাসদাসীদের গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখত। ঋকবেদে মজুরির বা মজুরের কোনো উল্লেখ নেই।**

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সালের সময় থেকে কৃষি উৎপাদনের লোহার ব্যবহার শুরু হল। কৃষি হয়ে গেল অর্থনীতির ভরকেন্দ্র। কৃষি সমাজও অর্থনীতিতে একগাদা পরিবর্তন নিয়ে এল। অনেক ধরনের পেশা বাড়ল। ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটল। দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ শুরু হল। কৃষি মালিকানার চরিত্র বদলাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে জনগণের কয়েকটি অংশে বিশাল অর্থ সঞ্চিত হল। শ্রমের চাহিদা বেড়ে গেল। মজুরি দিয়ে শ্রম কেনা শুরু

হল। ফলে এই সময় থেকে জমিকে কেন্দ্র করে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক (সামন্ততন্ত্র) তৈরি হল। এখন থেকে শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্ব দেখা গেল। ভারতে শুরু হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের যুগ।

এই সময়ে কিছু মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের ছবি পাওয়া যায়। বাৎসায়নের কামসূত্রে নাগরিকদের জীবনযাপনের পদ্ধতি তার প্রমাণ দেয়। গৌতম বুদ্ধ ক্রীতদাসদের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। ঋণখেলাপী ও পলাতক দাসদের জন্য সঙ্ঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। বুদ্ধের আদর্শ সমাজে দারিদ্র ও শোষণের কোনো স্থান ছিল না। বুদ্ধ বা অশোক দুজনেই দাসদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল যাতে দাসদের দিয়ে বেশি কাজ করানো যায়। এরফলে সুবিধা পেয়েছিল মহাজন ও বিত্তশালী শ্রেণী। বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে মিল ছিল এই যে উভয় ধর্মই পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে মান্য করার পক্ষপাতি ছিল। বলা যায় এরা ছিল শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক। মৌর্যযুগে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। এইসময় আইনী সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষপে করল। এই প্রথম শ্রমসংক্রান্ত একটি সামগ্রিক নিয়মাবলী প্রচলন করা হতো। নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

এই সময়ে আর্যরা যাতে বংশানুক্রমিক দাসত্বের শিকার না হয় তাই তাদেরকে পৃথক করে কতগুলো নিয়ম তৈরি করা হয়েছিল। এদের জন্যে যে পৃথক আইন তৈরি করা হয়েছিল, তা হল–

(ক) এরা অবসর সময়ে রোজগার করতে পারবে

(খ) বাবা মা-র সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে

(গ) মহিলা দাসীদের ওপর যৌন অত্যাচার চলবে না।

রাষ্ট্র গঠন

ভারতে প্রথম রাষ্ট্র মগধ। এর উত্থানের ভূমিকা ছিল রাষ্ট্রের দ্বারা অ-আদিবাসীদের জমি নিয়ন্ত্রণ, কৃষি বৃদ্ধি করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি (বসতি স্থাপন করিয়ে) ধাতু ও খনির উপর একটানা মালিকানার সাহায্যে রাষ্ট্রের প্রচুর মুনাফা অনেক নতুন মানুষ জাত হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। ষোড়শ জনপদ এর বদলে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে শুরু করলো।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে ভারতে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। কুরু, পঞ্চাল-এর মত রাষ্ট্রসংঘ পুরনো কোন শক্তি স্থান গ্রহণ করে। এই সময় যে ধর্মশাস্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল সেখানে ব্রাহ্মণদের সামাজিক আধিপত্যের যে ছবি চিত্রিত হয়েছে তা একপেশে কারণ বুদ্ধ বা মহাবীরের মতো ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুতদের হাতেই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যার সাথে সম্ভবত বৈশ্য বা শূদ্ররাও সহমত ছিলেন।

মৌর্য যুগে বিশাল জনসমষ্টি এবং অনেকগুলি অঞ্চল নিয়ে প্রথম একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। মহেঞ্জোদাড়ো ছিল শুধুমাত্র নগররাষ্ট্র। দাসদের সুরক্ষার জন্য আইন তৈরী করা হয়েছিল। রাষ্ট্র ছিল সবচেয়ে বড় উদ্যোগপতি। ব্যক্তিমালিকারা যেন বিপুল পরিমাণ দাস শ্রমিক নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং রাজার নিজের জমিতে দাস, কর্মকার

এবং কারাবন্দীদের দিয়ে নিপুণভাবে চাষের কাজ করানো হত। মৌর্য সাম্রাজ্যেই প্রথমবার রাষ্ট্রপরিচালিত ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দী দেড় লাখ ক্রীতদাসের কাজ করার খবর পাই। অর্থশাস্ত্রে এমন এক নিয়ন্ত্রিত দাসত্বের অস্তিত্বের ছবি পাওয়া যায় যার মধ্যে ব্যক্তিগত শোষণ তো আছেই কিন্তু রাষ্ট্র নিজেই শ্রমের বৃহত্তম শোষক এবং প্রজাদের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্যকারী। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে যীশুখৃষ্টের জন্মের পর ৫০০ বছর ধরে তীব্র সামাজিক সংঘাত হয় এবং বর্ণসংকর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জাতিভেদে 'ওপরতলা', 'নীচুতলা' তত্ত্ব ক্রমশ পিছু হঠছিল এইজন্য **জাতিভেদকে জোরালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক বর্ণগুলোকে ব্রাহ্মণ্যবাদী মর্যাদার সঙ্গে খাপ খাওয়ানর জন্য মনুসংহিতা রচিত হল। নিয়তিবাদকে নিয়ে আসা হল।** ব্রাহ্মণ্য সমাজ আরও প্রসারিত করার জন্য প্রাকৃত ভাষায় ভাগবত ও পুরান দলবদ্ধভাবে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়।

মৌর্য যুগ থেকে যে ঋণদাসত্ব চালু হয়েছিল তা প্রতিবাদহীন এক শ্রমজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করল। দাসশ্রমের পরিবর্তে তৈরী হল 'বাঁধা মানুষ' বা নির্ভরশীল মজুর। খরার সময় বা ফসল ভালো না হলে নীচু জাতের কৃষকরা ঋণের ফাঁদে পড়ে যেত –জমি হারিয়ে ভাড়া করা মজুর এবং শেষ পর্যন্ত বাঁধা মানুষের পরিণত হত। এইভাবে ভারতবর্ষে একটা সবসময় ঋণগ্রস্ত শ্রমজীবি শ্রেণী তৈরী হল। কোসাম্বীর কথায় ''এরা হল দাসপ্রথার একেবারে ভারতীয় ধরণ। ইউরোপীয় ধ্রুপদী দাসপ্রথার এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস প্রথার নতুন সংস্করণ।''

এই সময়ের দাসপ্রথার ইতিহাসের পটভূমিকায় দাসদের চেয়ে দাসীদের প্রধান্য দেখা দেয়। তবে তা আর্য বিজয়ের প্রথম দিকে। মেয়েদের মূল্যবান বলে মনে করা হত কারণ তারা ছিল 'উৎপাদকের উৎপাদক'। জৈবিক চাহিদাও ছিল। সন্তানধারণের প্রয়োজনও ছিল। আর্যদের কৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য পুরোহিতদের দাসী উপহার দেওয়া হত। সামন্ত পরিবারের দাসীদের গৃহকাজ করা হত না। কার্যত তারা ছিল যৌনদাসী।

অর্থশাস্ত্রে অনেক বেতনভোগী গণিকা দাসীর নির্দিষ্ট কাজের উল্লেখ আছে। কেউ রাজার মাথায় ছাতা ধরে, কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করে, আবার কেউ বেশ্যালয় চালায়।

ভারতের জাত নির্ধারিত হয়েছে পেশার ভিত্তিতে। জাতও জন্মগত, পেশাও জন্মগত। মনু সংহিতায় এই প্রথাকে বিধিবদ্ধ করা হল। ফলে শ্রমিক পেতে অসুবিধা থাকল না। **বংশ পরম্পরায় একাজ করতে হবে ও অন্য কোন পেশায় যেতে পারবে না বলে দরকষাকষির ক্ষমতা কমে গেল। ইউরোপীয় দাসদের মত অন্য কোন পেশায় যাবার অধিকার ছিল না।** জাতপাত ব্যবস্থা শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের ভয় দেখিয়ে প্রতিরোধ স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা হয়।

তবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসেরা কি কখনো বিদ্রোহ করেনি? যতদূর জানা গেছে একবারই মাত্র তা ঘটেছে। শাক্যদের দাস কর্মকাররা শাক্য রমণীদের ওপর অত্যাচার করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। দাস নেতার নাম ছিল বর্গিল। কিন্তু সে মনোনীত হত না নির্বাচিত, জানা যায় না।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

ফিউডালিজম-এর বাংলা সামন্ততন্ত্র। বৈদিক সাহিত্যে সামন্ত বলতে বোঝানো হয়েছে

প্রতিবেশী রাজাকে। গুপ্তযুগের সময় থেকে জমির ওপরে নির্ভরতা বাড়তে শুরু করে।

বিগত ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী থেকে দেখা যায় দানপত্রে কিছু কিছু ভূমির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের নামের তালিকা দেওয়া হত। কৃষকরা আবাদী জমির সংলগ্ন হয়েই চাষ করত। দান করা জমির সঙ্গে অনেক দাসও থাকত। ভারতে সামন্ততন্ত্রের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর দাসপ্রথা দুর্বল হতে থাকে। এই সময়ে ঋষি নারদ দাসমুক্তির বিধি বিধান রচনা করেছিলেন। **ভারতে যে দাসপ্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল তা কোনো মানবিক কারণে হয়নি। জমির বিভাজন এবং ভূমি অনুদানের ফলে ভূমি বিচ্ছিন্নতা হয়েছিল। পরিবার পিছু জমির আয়তন কমে যাওয়ায় চাষের কাজের বেশি সংখ্যক দাস বা শ্রমিক নিয়োগ করা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক ছিলনা। সামান্য কয়েকজনকে রেখে বাকিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে উৎপাদনের সুবিধার জন্য শুদ্রদের (যারা প্রধানত দাস ছিল) কৃষকে পরিণত করা হয়। গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত শূদ্রগণ কৃষকে পরিণত হয়ে গেল। শূদ্রদের দাস বা ভাড়াটে শ্রমিক থেকে কৃষকে উত্তরণ ঘটল।**

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটলেও দাসপ্রথা থেকেই যায় বেশ কিছু জায়গায়। সুলতানি আমলে আমরা রাজপ্রাসাদেই দাসের সন্ধান পাই। পরবর্তীকালে ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে চেঙ্গিস খান, গজনী মামুদ প্রভৃতি হানা দিয়ে লুঠপাট করে ফিরে যেত। লুঠের সামগ্রীর মধ্যে মানুষও ছিল। কারাকোরাম পর্বতে খাইবার পাসের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতে শীতে অনেক মানুষ মারা যায়। এইজন্য পাহাড়টার নামই হয়ে যায় হিন্দুকুশ। 'কুশ' মানে মৃত্যু। ট্রাইবাল রাষ্ট্রের বদলে গড়ে উঠতে লাগলো সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। পূর্ণ বিকাশ গুপ্ত যুগে।

সামন্ততন্ত্র একটা বিকেন্দ্রীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। জমির মালিকানা বিকেন্দ্রীকৃত ছিল কিনা, ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল কীনা, এগুলোই জরুরী প্রশ্ন। ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের পিছনে প্রধান অবদান ভূমিদান প্রথার। রাজারা শুধু ভূমিদান করতেন না, ভূমির ওপরে গ্রহীতাকে সব কিছুর অধিকার – কর বসানোর অধিকার, বিচারের অধিকার এমনকি জমির অধিকারও–ছেড়ে দিতেন। অথচ এগুলি রাজার সার্বভৌমত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

সামন্ত প্রথা খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। গুপ্ত যুগে রাজা গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করতেন। তারা শেষপর্যন্ত অর্ধ সামন্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। ভূমিদান গ্রহীতারা গ্রামবাসীদের উৎপন্ন ফসলে প্রাপ্ত অংশ থেকে একাংশ নিজের জন্য রাখতেন। বেশিরভাগ অংশ রাজার জন্য পাঠাতেন। মন্দির-মঠকেও ভূমিদান করা হত।সম্ভবত গুপ্তযুগে রচিত ও প্রকাশিত অমরকোষ নামে একটি সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় তখন নগরে কারিগর ছিল, শ্রমিক ছিল।

মৌর্যযুগে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যবসা ক্রমশ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্থানীয় প্রধানদের পরিচালনায় শুরু হয়। গুপ্ত যুগ থেকে মুদ্রার অভাব আত্মনির্ভর ব্যবস্থার ওপর স্থানীয় কেন্দ্রের উদ্ভবে সামান্য পরে।

পাল ও প্রতিহারদের আমলে স্থানীয়ভাবে স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য সামন্তবাদী

অর্থব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হত না। পালদের আমলে গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে জানা যায়, গ্রামে শুধু চাষীরাই নয়, ব্রাহ্মণ, কর্মকার, কুম্ভকার, নাপিত, বণিক, কারিগর, চণ্ডাল সবাই ছিল। এইভাবে গ্রামের আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থা রাখার জন্য গ্রামের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করতে পারে এমন সব ব্যক্তির আবশ্যকতা ছিল।

প্রাচীন যুগ থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ভূমি দান প্রথা। এইসময় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থায় অনেক শিথিলতা দেখা যায়। বৈশ্য ও শূদ্ররা ট্যাক্স দিতে ও শ্রমদান করতে অস্বীকার করে। এইসময় অন্যান্য অনেক পদ্ধতির সাথে বেতন দেওয়ার পরিবর্তে ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হয় ও দানগ্রহীতাদের হাতে ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই নতুন ভূস্বামীরা কৃষকদের স্থানীয়ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পেয়ে ছিল। এর ফলে অনেক অনাবাদী জমিও চাষের আওতায় চলে আসে। উপজাতিক গোষ্ঠীগুলোকে জয় করে রাজার অধীনে আনা ও তাকে কৃষিতে নিয়োগ করা ট্যাক্স দিতে বাধ্য করা হয়।

রাজা দান করা ভূমির ওপর থেকে কর, চারণ ভূমির অধিকার, খনির অধিকার, আইন-শৃঙ্খলারক্ষার অধিকার সবকিছুই দান গ্রহণকারী ওপর ছেড়ে দিতেন। দানে লেখা থাকতো যতদিন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী, সমুদ্র থাকবে ততদিনই দান গ্রহণকারীর অধিকারী থাকবে।

লোহা আবিষ্কারের ফলে কৃষির বিস্তার হয়। তার ফলে চাষের কাজে শূদ্রদের ব্যবহার করা শুরু হয়। শূদ্ররা কৃষকে পরিণত হয়ে যায়। এই সময় অর্থশাস্ত্র রচিত হয়েছিল ওটা রাজ্য শাসনের আইন হিসেবেই পরিচিত। নগরের পতন শুরু হবার পরে কারিগররা নগর ছেড়ে গ্রামে চলে আসে। তারা গ্রামের কৃষকদের জন্য কারিগরি কাজ করে দিত ও ফসল উঠলে কৃষকরা তাদের ফসলের ভাগ দিত। কারিগররাও বহু ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে চাষ করতে শুরু করে কৃষকে পরিণত হলো। আগেই বলা হয়েছে পুরোনো সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্রের উত্তরণের অন্যতম প্রক্রিয়া ছিল ভূমিদান। খ্রীঃ পূর্ব ২০০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চলত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও তা দেখা যায়। এটা কেন্দ্রিকতার লক্ষণ। এখানে দেখা যায় সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৪৮ হাজার পণ এবং সর্বনিম্ন বেতন ছিল ২০ পণ। স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। আইন প্রণেতা বৃহস্পতি ভূমিদান প্রথার সুপারিশ করেন। ইউ এন সাং-এর বক্তব্য অনুযায়ী 'গভর্নর', মন্ত্রী, বিচারক ও আধিকারিকদের ভূমি দেওয়া হতো বেতনের বদলে। এর ফলেই বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। সামন্ততন্ত্রের অন্যতম লক্ষণ হলো বিকেন্দ্রীকরণ। শূদ্ররা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে মজুর হিসেবে ক্ষেতে কাজ করত। তারপর থেকে শূদ্ররা পরিবর্তিত হয়ে গেল কৃষকে।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই দূরপাল্লার বাণিজ্য দুর্বল হতে থাকে। রোমান সরকারের সাথে বাণিজ্য তৃতীয় শতাব্দীতে এবং ইরান ও বাইজেনটাইন-এর সাথে বাণিজ্য ষষ্ঠ শতকেই শেষ হয়ে যায়। বাণিজ্যের অবনতির ফলেই শহরগুলো রুগ্ণ হতে শুরু করে। অনেকগুলি শহর ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়। কারিগররা ধীরে ধীরে গ্রামে চলে আসে। এই সময় থেকে গ্রামে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি শুরু হতে থাকে। এজন্যই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা এবং মার্কস একে এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশান বলেছেন। এটা আসলে ছিল সামন্ততান্ত্রিক

উৎপাদন পদ্ধতি। প্রথম দিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ছিল। জমির মালিকানা নিয়ে তিন বা চার রকমের শ্রেণী হয়ে গেল। রাজা, দান গ্রহীতা কৃষক, সেখান থেকে উপ-কৃষক মালিকানা। ভূমিদানের ফলেই এটা ঘটলো। জমির অধিকারের উপরে এই যে নতুন বিভাজন এর ফলে বর্ণ এবং জাতি বিভাজন স্পষ্ট হয়ে যায়। মধ্য যুগে (শহরের অবক্ষয়ের ফলে) কৃষির বিস্তার হয়েছিল বিপুলভাবে। শহরের মধ্যের অধিবাসী, সৈন্যবাহিনী, প্রশাসনিক আধিকারিক, কারিগর, বণিক ও ব্রাহ্মণেরা শহর থেকে গ্রামে চলে আসে।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ছিল স্বাধীন কৃষি। ইউরোপীয় ম্যানের ব্যবস্থা থেকে আলাদা। ইউরোপে রাজার রাজত্বে মানুষ ও জমির ওপর রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। তিনি তার এলাকার অংশ কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এই ভাবে কর্তৃতেবর একটি পিরামিড গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতে কৃষিজমির ওপরে রাজা বা সুলতানের অধিকার ছিল না। কৃষক তার প্রভুর ভূমিদাস ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মানরে কৃষক ও তার প্রভুর মধ্যে যা সংঘাত হয়েছে ভারতে তা হয়নি। এখানে যেটুকু বিরোধ হয়েছে তা ফসলের ভাগ নিয়ে। ভারতে কৃষক উচ্ছেদ না করা ছিল মূল কথা। কারণ চাষে অগাধ জমি পড়ে থাকত। **তাই কৃষকের জমি আত্মসাৎ না তার উদ্বৃত্ত ফসল আত্মসাৎ করাটাই ছিল সামন্তদের কাজ। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চীন রাশিয়া ইউরোপে প্রাক্ আধুনিক যুগে যে সংঘাত হয়েছে তা ছিল শ্রেণীসংগ্রাম। কিন্তু ভারতে শুধুমাত্র কৈবর্ত বিদ্রোহ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনটে জেলায় আন্দোলনে বা বিদ্রোহের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অনেকগুলি বিদ্রোহে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল, কিন্তু কৃষকদের দাবি স্থান পায়নি। জাতপাত ও ধর্মের বিভাজনে কৃষকদের চেতনার মান খুবই দুর্বল থাকার জন্য এই পরিণতি হয়েছিল। ইউরোপে সংঘাতের রূপ ছিল লাঙলে-তরোয়ালে যুদ্ধ। এখানে যুদ্ধ হত তলোয়ারে-তলোয়ারে।** তাই কৃষক সমাজ বা গ্রাম এই সংঘাতগুলোতে নিষ্ক্রিয় থাকত।

ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সাধারণভাবে ইংলন্ডের মত সৈন্য সরবরাহকারীদের জায়গিরদানের মধ্যে দিয়ে ঘটেনি। বরং ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে ভূমিদানের ফলে ঘটেছিল। আরো একটি পার্থক্য দেখা যায়, ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের পিছনে বিদেশী আক্রমণকারীদের একটা ভূমিকা ছিল। ভারতে তা ছিল না।

আবার মিলও ছিল। যেমন কম হলেও ভারতে বেগার প্রথা ছিল। ইউরোপের মতন। ইউরোপেও কিষানরা অধিকাংশ সময় মালিকদের জন্য ব্যয় করত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতে স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা বেশি ছিল। ইউরোপে মধ্যযুগে রাজার সেবা করার পুরস্কার ছিল ভূমিদান। ভারতে এবং ইউরোপে পুরোহিত বা খ্রীষ্টীয় সংগঠনগুলোকে জমি দেওয়ার মধ্যে মিল থাকলেও গীর্জা ছিল অনেক সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে এখন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র শব্দটি চালু হয়ে গেছে। ভারতের মত যে দেশগুলিতে ইউরোপের মত সামন্ততন্ত্র ছিল না তাকে আধা সামন্ততন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়।

ভারতে অনেকসময় সিংহাসনে উত্তরাধিকারীও নির্বাচন করত সামন্তরা। যেমন গোপাল। এরকম আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে কৃষকদের অবস্থা হয়ে গেল প্রায় দাসদের মতো। অপরদিকে নতুন নতুন কর আদায়ের ফলে রাজকীয় সেনা বা অফিসাররা গ্রামে এলে জোর করে টাকা বা রসদ তুলত। এটা রাজকোষ পর্যন্ত পৌঁছাত না ইউরোপের সামন্ত প্রথার মতই ছিল। জমির মালিকানা বদল হলে জমির সঙ্গে যুক্ত কৃষক, খেতমজুর নতুন মালিকদের অধীনে চলে যেতে হত। বাৎসায়নের লেখায় দেখা যায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নাগরিক জীবন কেমন ছিল। ভূমিদান গ্রহীতা অধীনস্ত কৃষকদের কোনো সুরক্ষা ছিল না। দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য রাজা বা সম্রাট কর মকুব করে নিলেও অনুদানভোগীরা সাধারণত এত উদারতা দেখাতেন না।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মতোই অস্ত্রের উপরেই নির্ভর ছিল। গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে প্রতিরক্ষাহীন করে রাখাই বেশি সহজ ছিল। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ বিকশিত যুগে (৫০০ খ্রী-১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত) অর্থ ব্যবস্থায় চারটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উদাহরণ।

(১) ভূমির উপর রাজার ও সামরিক অধিকার ক্রমশ কমে যাওয়া।

(২) উপসামন্ত্রীয়করণ, জমি থেকে উৎখাত, নতুন নতুন কর আরোপ ও বেগার খাটার জন্য কৃষকদের অবস্থার অবনমন।

(৩) ব্যবসা ও শিল্পের লাভ থেকে জায়গিরদার বদলে যাওয়া।

(৪) স্বনির্ভর আর্থ ব্যবস্থা মুদ্রার কম ব্যবহার নতুন কর আরোপ ও বেগার খাটা এই সময়কালীন বৈশিষ্ট্য ও সবই সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ। গুপ্ত যুগের আগে একসময় জমির উপরে গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মালিকানা ছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগীয় বা উত্তরোত্তর যুগে জমি ভাগ হতে শুরু করে।

গোচারণ ভূমি ও জলাশয়ে সর্বজনীন অধিকার ছিল। পরবর্তীকালে অনুদানের মধ্য দিয়ে একত্র মালিকানাও শুরু হয়। জমির বন্ধক শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপে একই জমির উপর অধিকার দাবি করার জন্য **পিরামিডের মতো** মালিক গোষ্ঠী যা ভারতেও ছিল তবে ইউরোপে দাবিদারির **সংখ্যা ভারতে যেহেতু** কম ছিল, মোগল আমলে এই আইন পরিবর্তিত হয়ে **জমির উপরে** সত্ত্বাধিকার দেওয়া বন্ধ হয়। প্রায় ১৩০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভূমিস্বত্ত্বের প্রধান নিয়মগুলি সামন্ততন্ত্রের পরিচয় বহন করে।

কৃষকদের দিক থেকে বিদ্রোহ আন্দোলন চোখে পড়ে না, সম্ভবত শোষণের বিরুদ্ধে গ্রাম পরিত্যাগই ছিল একমাত্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুর সময় স্বনির্ভর অর্থ ব্যবস্থায় জমির সাথে আবদ্ধ থাকায় কৃষকদের গ্রাম পরিত্যাগ সহজ ছিল না, ভারতীয় সামন্তবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রথমত **ভূমি অনুদানের** ফলে মধ্য ভারত, উড়িষ্যা ও পূর্ববঙ্গে বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়েছিল, পুরোহিতরা আদিবাসীদের হার ব্যবস্থার ও আজ প্রয়োগ শিখিয়েছিলেন। তাছাড়া নক্ষত্র, বর্ষা ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিত করিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত ভূমি অধিকার **আইন শৃঙ্খলা রক্ষার** সহায়ক হয়। তৃতীয়ত ভূমি অনুদানের ফলে **ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির যে প্রসার** ঘটেছিল তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সংহতি গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছিল। (যদিও **তা মানবতা** বিরোধী ছিল) চতুর্থত ভূমি অনুদানের ফলে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা বিভিন্ন উপজাতিকে

ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে স্থান করে দেওয়ার ফলে **অসংখ্য জাতি** ও বর্ণ শংকর (ব্রহ্ম পুরাণ অনুযায়ী প্রায় একশো উৎপত্তি হয়েছিল)। পঞ্চমত **ভূমি অনুদানের** ফলে নতুন আবাসযোগ্য জমিতে নতুন নতুন আদিবাসীকে বর্গা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার ফলে একই রকম **সামাজিক অবস্থা** তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল। **যাতায়াতের অসুবিধার জন্য রাজনৈতিক ঐক্য রাখা কঠিন ছিল বলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল। ফলে অনেক স্থানীয় আর্থ সংস্কৃতির জন্ম হয়।**

প্রাচীনযুগে আলোক প্রাপ্তির সময়কাল

প্রাচীন যুগে সমানে পরিবর্তন চলেছিল। প্রতিষ্ঠিত সমাজ, কোনো এক সামাজিক শ্রেণীর আধিপত্য, ধর্মীয় রীতিনীতি, প্রভাবশালী ভাবাদর্শ সব কিছুতেই কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল। এক এক সময়ে বিপরীত স্রোত এসেছে। সংঘর্ষ হয়েছে। কখনও তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী, কখনও অদূরপ্রসারী। সব পরিবর্তনের প্রতিটি দিক সযত্নে অনুধাবন করা দরকার। তবেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের গতিসূত্র ঠিক মত ধরা যাবে। মনে রাখা **দরকার সব পরিবর্তন কিন্তু গুণগত পরিবর্তন নয়। ছোট বড় অজস্র পরিমাণগত** পরিবর্তন একসময়ে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। পরিবর্তন প্রথমে ইমারতের উপরতলাতেও দেখা যেতে পারে। তারপরে ছাপ পড়ে বুনিয়াদের উপর (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৮১-৮২)

একটি সমাজ যখন অপেক্ষাকৃত উন্নততর নতুন সমাজে পরিবর্তিত হয় তখন সেটা একদিন বা একবছরে হয় না। ফ্রান্স দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে যখন ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের উত্তরণ ঘটেছিল তাতে কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছিল। একইভাবে শিল্প বিপ্লবের সময় ইউরোপে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের উত্তরণের সময় কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। একটি সমাজ থেকে একটি উন্নততর সমাজে পৌঁছোনোর সময় জ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বিরাট বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এখানে প্রাচীন যুগ দীর্ঘ সময়ব্যাপী খ্রীঃ পূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রীষ্ট জন্মের পরের ৫০০ বছর অর্থাৎ ৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত চলে। এই দীর্ঘ ৩৫০০ বছরের মধ্যে শেষের ১০০০ বছর অর্থাৎ খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য সবকিছুতেই বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল। এই সময় রাজনীতি, অর্থনীতির জীবনযাত্রা, উৎপাদনের প্রক্রিয়া, দর্শন ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল।

প্রাচীন যুগে খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ সাল থেকে ৬০০ খ্রীঃ সময়কালকে চিহ্নিত করা যায় প্রাচীনকালের আলোক প্রাপ্তির সময়কাল হিসেবে। এই সময়কাল ছিল প্রাচীন ট্রাইবাল সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের কাল।

পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসে কখনও কখনও এক সৃষ্টিশীল পর্ব দেখা যায়। শিল্পে, সাহিত্যে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, দর্শন চিন্তা, রাষ্ট্র চিন্তা, সমাজ চিন্তা, সব কিছুতেই। এটা কোনো দৈব খেয়াল নয়। এর একটা কার্যকারণ যোগ আছে। অনুকূল সামাজিক ভিত্তি থাকলে তত্ত্ব ও ভাবনা প্রয়োগে বিস্তার হয়। (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৮১-৮২)

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতি জমি, রাজস্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রয়োগ হয়। এতে জমির মাপ, ট্যাক্স নির্ধারণ করা সবকিছুর সুবিধা হয়। শূন্য ও দশমিকের আবিষ্কার এই যুগের একটি বিরাট অবদান। এটি আবিষ্কারের পর আরবদের হাত হয়ে ইউরোপে পৌঁছোয় ও ইটালিয়ানরা একে বুক-কিপিং-এ ব্যবহার করে। ভারতে খুব নির্দিষ্টভাবে এর ব্যবহার হয়নি। ভারত ষষ্ঠ থেকে দশক শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যে দুর্বল ছিল তাই শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার করতে পারেনি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কৃষি-জ্যোতির্বিজ্ঞান বিকশিত করেন ব্রহ্ম গুপ্ত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহ-মিহির বৃহৎ সংহিতা লিখেছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে গৃহ নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন, নতুন গ্রাম পত্তন করার বিষয়ে তার মত অনেকেই মেনে চলত। বরাহ মিহিরের ঋতু পরিবর্তন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়ে কৃষকদের পক্ষে কৃষি ক্যালেন্ডার প্রয়োগ করতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন ধরনের জমির কাগজপত্র দেখে মনে হয় জ্যোতিষী বা দৈবজ্ঞের কাজ এই সময় থেকে শুরু হয়। এই সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখা যায় বিবাহ প্রথায় কন্যাদানের সাথে ভূমিদান জড়িত হয়ে পড়ে এর ফলে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। ভূমিদানের ফলে রাজা এবং কৃষকের মাঝে জমিদার তৈরি হল। বৈশ্যরা ছিল পরিশ্রমী কৃষক। এই সময় বিশাল সংখ্যক আদিবাসী শূদ্র-র তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এর ফলে বিশাল সংখ্যক শূদ্র যারা অতীতে ক্রীতদাস ছিল, গৃহ-কর্মে অথবা কৃষি কাজে শ্রমিক এবং নিম্নস্তরে কারিগরির কাজ করত তারা কৃষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ সমাজ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে মধ্য দেশ থেকে বাংলা ও দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হল। ভূমিদানের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকে উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে চলে যায়। এই সময় শূদ্রদের মধ্যেও অনেক জাতিগত ভাগ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সমাজ মিশ্রণ হয়। মনুর লেখাতেই দেখা যায় ৬১ ধরনের জাতি আছে। ব্রাহ্মণ দেবতাদের সাথে উপজাতি দেবতাদের সম্মিলনও হয়ে যায়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলির উদ্ভব হতে থাকে। যেমন – অন্ধ্র, আসাম, বাংলা, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাড়ু। বাংলা দুটো ভাগে ভাগ ছিল গৌড় এবং বঙ্গ। পরে সবটা নিয়ে নাম হয় বঙ্গ। বিদেশী এবং দেশীয় মানুষদের মিশ্রণে বহু উপজাতির সৃষ্টি হয়। বিশাখা দত্তের মুদ্রা রাক্ষস নাটকে দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের পোশাক, আচরণ ও ভাষা পৃথক। অষ্টম শতকের একটি জৈন গ্রন্থে ১৮টি বড় জাতির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এইভাবে ষষ্ঠ শতকের জাতিসত্তা গুলোর বিভাজনের সন্ধিক্ষণের ইতিহাস হয়ে ওঠে।

ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের অপভ্রংশ দিয়ে নতুন নতুন ভাষা তৈরি হয়। এগুলির কোনোটি হিন্দির মতো কোনোটি গুজরাটির মতো। এর মধ্যে আদি হিন্দি, আদি বাংলা, আদি মৈথিলি, আদি অসামিয়া ভাষাগুলি সপ্তম শতক থেকে তৈরি হয়েছে। আদি গুজরাটি ও আদি রাজস্থানী ভাষা প্রাকৃত থেকে তৈরি। এই সময় আঞ্চলিক লিপিগুলো তৈরি হয়। ভূস্বামী শ্রেণী যেহেতু সামাজিক পিরামিডের উচ্চস্থানে ছিলো তাই অভিজাতদের মত করেই গদ্য এবং কবিতা লেখা হতো এবং শুধু সম্পত্তিবানরাই এতে খুশী হতো। কোসাম্বীর মতে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যে যৌনতা এবং ধর্ম এই দুটোই ছিল প্রধান উপজীব্য।

বৃদ্ধ মনু বা বৃহৎ পরাশর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আইনি গ্রন্থ রচনা করেন। নানা ধরনের আইন গ্রন্থ ৬০০-৯০০ খ্রীঃ মধ্যে রচিত হয়েছিল।

দেবতাদের অনেক স্তর ভেদ ছিল। বিষ্ণু, শিব এবং দুর্গা ছিলেন সর্বোচ্চ দেবতা। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য নতুন সংগ্রহ করা এলাকায় অনেক আদিবাসী আচার ও দেবতাকে ব্রাম্মণ্য সমাজে গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে মহিলা দেবীদের। এ সময় সপ্তম শতাব্দী থেকে তন্ত্র-মন্ত্রের অনুপ্রবেশ জৈন, বৌদ্ধ, শৈব এবং বৈষ্ণব এই ধর্মগুলির মধ্যে শুরু হয়।

উপজাতিদের মধ্যে মাতৃ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে মহিলারা অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতো। উৎপাদনে ভূমিতে লোহা-লাঙল ব্যবহারের জন্য মহিলারা ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে আদিবাসীদের আত্মস্থ করে নেবার জন্য মহিলা দেবতাদের স্বীকৃতি দেওয়া হল এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তাদের সম্মানীয় স্থান দেওয়া হল। সমাজে মহিলাদের অবস্থার অবনমন করা হল কিন্তু ক্ষতিপূরণ করা হল মহিলা দেবতাদের উচ্চাসন দিয়ে। তন্ত্র-মন্ত্রে মহিলা দেবতাদের পূজা বেশি হতো।

ভারতীয় দর্শন

শ্রেণী থাকলেই দর্শন জন্ম হয়। শ্রেণী স্বার্থে দর্শন ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় দর্শন অখণ্ড নয়।

ভারতীয় ঋষিরা শুধুই আধ্যাত্মিকতার সাধনা করেননি। তাদের বহুমুখী, বিভিন্নমুখী, অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী মতামত ছিল।

সম্পত্তি রক্ষার জন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যার দায়িত্ব পুরোহিতদের ছিল। ওদেরও সম্পত্তির ভাগ দেওয়া হতো। কোনো কোনো রাজাও ব্যাখ্যা করতেন। 'যেমন জনক'। এরা নিজেদের স্বার্থেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা হতো।

বৈদিক সাহিত্যে পার্থিব জীবনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়র মন্ত্র উচ্চারিত হতো।

উপনিষদের যুগে ঐ মন্ত্র আধ্যাত্মবাদী আবরণে ঢাকা পড়ে। আরণ্যক ঋষিরা ধনী ছিলেন। এই সময় পুরোনো যাগ-যজ্ঞ ত্যাগ করে নিয়ে আসা হয় ব্রহ্মের ধারণা। ঋষি যাজ্ঞবল্কের কথা।

নাস্তিক, আস্তিক কাকে বলে তা ঠিক হয় বেদ কে লিখেছে সে সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে। মানুষ না দেবতা? তিনটি সম্প্রদায় নাস্তিক –চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন।

ছটি দর্শন – ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত – ষড় দর্শন,

ভারতীয় দর্শনের ছয়টি শাখা কাজ করতে থাকে। এর মধ্যে চারটি শাখা বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুবাদী দর্শনকে ভোগবাদী দর্শন বলে চিহ্নিত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে প্রাচীন যুগের পর নতুন কোনো দর্শনের সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তীকালে যে সমস্ত দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে, তারা সকলেই পুরানো দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে বিকশিত করার চেষ্টা করেছেন। এটা ইউরোপীয় দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।। ইউরোপে

নতুন নতুন দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে পুরানোদের বক্তব্য নস্যাৎ করে। (যেমন হেগেল এবং মার্কস, এঙ্গেলস) শঙ্করাচার্য মনু সংহিতার সমর্থক ছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের মত প্রাণীহত্যা বন্ধকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বৈশেষিক - পৃথিবী ছিল পরমাণুপুঞ্জ — এটা তো নাস্তিকতা। কিন্তু পরবর্তীকালে গুলিয়ে দেওয়া।

নাস্তিকরা ছিল যুক্তি শাস্ত্রের প্রধান প্রণেতা।

মনু ও শংকরাচার্য।

তর্কবিদ্যার বিরোধিতা। বিবেকানন্দের কথা।

বিশ্বাসে মিলায় ঈশ্বর, তর্কে বহুদূর

বুদ্ধের ট্রাজেডি–

সংস্কৃত ভাষা ছিল অভিজাতদের ভাষা, অপরদিকে প্রাকৃত ও পালি ভাষা, ছিল জনগণের ভাষা, তা ক্রমশঃ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে লাগল। উপমহাদেশ ও এশিয়ার অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ল বুদ্ধের বৈপ্লবিক বাণী। অবদমিত নির্যাতিত মানুষ বৈদিক বিভেদকামী ধর্মের বিরুদ্ধে পেল সর্ব মানুষের এক মুক্তির দর্শন। মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রায় আটশো বছর বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও প্রতিপত্তির কাল। সম্রাট অশোক (খ্রী: পূ: ২৬৯-২৩২) থেকে হর্ষবর্ধনের (খ্রী: ৫৯০-৬৪৭) রাজত্বকাল। অবশ্য মাঝখানে তিনশো থেকে সাড়ে পাঁচশো খ্রীষ্টাব্দে দুশো থেকে আড়াইশো বছর গুপ্ত সম্রাটরা দেশ শাসন করেছেন।

গুপ্তরা (খ্রী: ৩২০-৫০০) ব্রাহ্মণ্যধর্ম মেনে চলতেন। কিন্তু তাঁরা বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা বা শত্রুতা করেননি। হর্ষবর্ধনের শাসনকাল শেষ হবার পর বৌদ্ধধর্মের মানুষরা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে। তারপরেই দক্ষিণ ভারত থেকে জাতিবিদ্বেষী মনুস্মৃতির গোঁড়া অনুগামী এক নয়া ব্রাহ্মণের ধর্মতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটলো আদি শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে তাঁর দর্শনের নাম মায়াবাদ বা অদ্বৈত বেদান্তবাদ। সাধারণভাবে "শঙ্কর মত" বলে খ্যাত। এই দর্শনের মূল কথা হলো ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা। এই দর্শনের চোখে বিশ্ব প্রকৃতি জীবজগৎ ও মানুষের সমাজ সংসার সব অসার ও মায়া বলে ঘোষিত হলো। বলা হলো মানুষের জীবনে চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত মোক্ষ। যা অষ্টম-নবম শতক থেকে শঙ্করের "বেদান্ত-ভাষ্য"-এর দর্শন মানুষকে শেখালো যে, পূর্বজন্মের কর্মফল তাঁর ইহধর্মের জাত-পাত-কর্ম সবকিছু ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই জীবনে সেইসব পরিণাম মেনে নিয়ে শাস্ত্র মতে চললে তাঁর মোক্ষ হবে। সেই প্রধান শাস্ত্রটি অবশ্যই মনুসংহিতা। একটি নতুন সমাজ মানসিকতা গড়ে দেওয়া হলো। অনুসরণীয় মূল নীতিগুলি হলো, ব্রাহ্মণ্যবাদ-বর্ণাশ্রম, ধর্মাচার, জাতি-কর্মভেদ। আরও পাকাপোক্ত করে দেওয়া হলো জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতার গোঁড়ামিকে। আগেই শুরু হয়েছিল বৌদ্ধদের উপর খবরদারি। পরে সনাতনপন্থী কুমারিল ভট্টদের হিংসাত্মক আক্রমণ নেমে এলো। শঙ্করের নেতৃত্বে সেটা অনেক সংগঠিত ও পরিকল্পিত। অত্যাচার, মঠ ধ্বংস, গ্রন্থনাশ, হত্যাও চলতে থাকল। সাম্যবাদী ও জাতিভেদহীন কোনো সংস্কৃতিকে তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। এই অত্যাচারের ফলে বৌদ্ধরা অনেকে শাক্ত-শৈব তন্ত্রাচারী হয়ে গেলেন

আত্মরক্ষার তাগিদে। একসময় যারা বৌদ্ধ হয়েছিলেন জাতপাত ভেদহীন হয়ে অপমান থেকে বাঁচতে তাঁরা আবার ব্রাহ্মণ্য সমাজে (চার বর্ণের সমাজে) ফিরে এলেন। তবে তাঁদের ধর্মটি তন্ত্র ও বৌদ্ধ আচারের মিশ্রিত এক সংস্কৃতি হয়ে উঠল। তাঁরাই ‘‘মহাযান’’ নামে পরিচিত, এখন যাঁদের আমরা মোটামুটি সহজিয়া বলি-সিদ্ধাই অবধূত, আউল বাউল ইত্যাদি।

জাতিধর্ম রূপান্তরের সেই চলমান প্রক্রিয়া সমাজদেহে চলতেই থাকল। দ্বাদশ শতকে ভারতে তুর্কিরা এল। তাদের মধ্যে জাতপাত ভেদ নেই দেখে আবার নীচু শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের জাতিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করলো। এর আগে যারা হিন্দু থেকে বৌদ্ধ হয়েছিল তারা বেশি বেশি মুসলমান হলো। একটাই তাগিদ জাতপাতের অত্যাচারের হার থেকে রক্ষা পাওয়া। এটা বেশি ঘটেছে আমাদের বাংলাদেশে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রমধর্মী অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন অপমানিত মনুষ্যত্বের মুক্তির দর্শন। তাঁর দর্শন বেদ, যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণত্ব ও জাতিভেদের অদ্ভুত নৃতত্ত্ব ইত্যাদির বিরোধী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে নীরব থাকলেন। মানুষ বুদ্ধের এই প্রেমঘন সাম্যের মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে গেল। বৈদিক বর্ণবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হলেন। চতুরতার সঙ্গে তাঁদের বৈদিক ধর্মের নানা পছন্দমতো ব্যাখ্যার শুরু করলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মের বিপ্লবী তত্ত্বকে নানা কায়দায় মৈত্রী ও করুণার নামে নানা প্রশংসায় মুড়ে দিলেন। একই সঙ্গে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল জন্মান্তরবাদে ভাগ্য ও কর্মফলের তত্ত্বকে জবরদস্তভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে বুদ্ধকে কল্পিত দশ অবতারের একজন বানিয়ে বুদ্ধকে করে তোলা হলো ‘হিন্দু’দের একজন আরাধ্য অবতার। ভারতে তিনি হয়ে রইলেন ‘হিন্দু’। অথচ তার বস্তুবাদী মানবিক ও সামাজিক সাম্যের দর্শনটি তাঁর জন্মভূমিতে আলাদা যোগ্য ঠাঁই পেল না। তাঁকে গ্রাস করলেন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। আজ ইতিহাসের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে বৌদ্ধধর্মকে দেশ থেকে তাড়ানো এবং অন্যদিকে নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকে হিন্দুদের অবতার বানানো ইত্যাদি এক ধরনের ধর্মীয় ছলনা ও আত্মপ্রতারণাও। এটা তাঁরা করেছেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বের শাসনে জাতপাতভেদকে টিকিয়ে রাখার জন্যে।

ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় এমন সর্বব্যাপী এমন সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। সেই প্রাচীনকাল থেকে সেই যে চারটি বর্ণের ব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু সমাজ আজ বহু বর্ণ, উপবর্ণ, শাখা বর্ণ ও সংকরবর্ণে ভাগাভাগি হয়ে আছে, বাংলা তার বাইরে নয়।

চার্বাক –

চিকিৎসা, গণিত, বিজ্ঞান সব গতি হারানো।

ই এম এস বলেছেন চীন এবং ভারত, ইউরোপ থেকে এগিয়েছিল। শংকরের ভাববাদী দর্শন তাকে পিছিয়ে দেয়।

মধ্যযুগ

মুসলিম তুর্কীদের শাসনকালে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। কিন্তু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রায়ত্ত

সংগঠনে উৎপাদনের উপর জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ। জাত-পাতের সংখ্যা বৃদ্ধি, চিত্র-কলা, লিপি, ভাষা, পূজা, উক্তি, তীর্থ এবং তন্ত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিচিতি শুরু হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে। চতুর্থ এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভূমিদানের প্রাথমিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুর্কি এবং মোঘলদের রাজত্বে আরও স্পষ্ট রূপ পায় ইকতা, জায়গির, ইনাম, নজরানা ইত্যাদি নামে। দেবত্তোর ব্রহ্মত্তোর ইত্যাদি নামে যে জমিদান, ভূমিদান হত মুসলিম শাসনের সময়ও অব্যাহত ছিল। হিন্দুদের জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি ছিল ধর্মশাস্ত্র ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ছিল কোরাণ ভিত্তিক।

মধ্যযুগে গ্রামীণ জনসংখ্যা সম্পদের মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল। উচ্চতম বা প্রথম শ্রেণীতে ছিল জমিদার, মহাজন ও বৈশ্য ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল ধনী ও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল নিঃস্ব অর্থাৎ মজুর তারা কৃষি মজুর, পরিষেবামূলক কাজ, চামড়া অথবা ছোটখাটো উৎপাদনশীল কাজ করতো। বারর খেতমজুরদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এরা ছিল নিচু জাতি। কৃষির উৎপাদনের জন্য জাতিভেদ প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা নির্দিষ্ট, সংরক্ষিত শ্রমবাহিনী তৈরি করে গেছে।

বাবরনামা গ্রন্থে বাবর লিখেছেন যে – চাষী ও গরিব লোকেরা সম্পূর্ণ খালি পায়ে থাকে আর লঙ্গুটা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে। মেয়েরা লুঙ্গ নামে এক ধরনের কাপড় পড়তো যার অর্ধেক কোমরে ও বাকি অর্ধেক মাথায় জড়ানো থাকতো। গরিব মানুষ শীতকালে রাত্রিবেলা ঘুটের আগুন জ্বালিয়ে তার আঁচে গরম থাকার চেষ্টা করতো। ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলেই কৃষকদের বাসস্থান ছিল কুঁড়েঘর। গৃহস্থালির জিনিসপত্রও ছিল খুব শোচনীয়। জল রাখা, রান্না করা প্রায় সব কিছুতেই মাটির পাত্র ব্যবহার করা হতো। মাটি ও কাদা দিয়ে তৈরি উনুন ব্যবহার করা হতো। সেই সময় প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হতো। বাংলা, বিহার বাদ দিয়ে ভারতের পূর্ব অংশে ১৫৫৪-৫৫তে, ভারতের পশ্চিম অংশে কাশ্মীরে ১৫৭২-৭৩খ্রীষ্টাব্দে, পশ্চিম ভারতে ১৫৭৪-৭৫, ১৫৯৬, ১৬৩০-১৬৩২ সাজাহান যখন তাজমহল তৈরি করাচ্ছেন তখন পাঞ্জাব, গুজরাট, কাশ্মীর, ওড়িশা ও দাক্ষিণাত্য ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে। ১৭৭০ সালে বারানসীর পশ্চিম থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। একমাত্র পাটনা শহরে ৯০ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৭০২ সালে দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকটি বিশেষ চরিত্র দেখা যায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া, লুটপাট, মানুষের স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস হয়ে যাওয়া, ছেলে মেয়ে বিক্রি করা এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নর মাংস খাওয়ারও রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লিতে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজত্বে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল যা সমসাময়িক কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দ রায়ের, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার ১২ মাসের দুঃখকষ্ট বর্ণনায় তা দেখা যায়। ফুল্লরা ছিল ব্যাধ কালকেতুর স্ত্রী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈঁচির ফল খেয়ে থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে খুঁদকুড়ো, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজার সময় প্রসাদী মাংস, মাঘ মাসে কুয়াশার ফলে শিকার হয় না আর চৈত্রে খরার জন্য ঘরে খাবার থাকে না। একমাত্র কার্তিক-অগ্রহায়ণে ধান ওঠার সময় তার অভাব কিছুটা মেটে।

চাষীদের ক্ষেত্রে আধুনিক মালিকানার সাথে মধ্যযুগের মালিকানার পার্থক্য ছিল। এখনকার চাষীরা ইচ্ছা হলে জমি ছেড়ে চলে যেতে পারে, জমি চাষ নাও করতে পারে।

কিন্তু মধ্যযুগে চাষ করাটা ছিল বাধ্যতামূলক। তা না করলে জুলুম করা, ভয় দেখানো, কয়েদ করা বা দৈনিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। তার কারণ তখন চাষীর সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু জমি ছিল প্রচুর। নিচুমানের জীবনযাত্রা আর আদ্যিকালের কুঁড়েঘর ছাড়া চাষীর ফেলে যাওয়ার মতো কোনো সম্পত্তি ছিল না। তাই অত্যাচারের ভয়ে চাষীরা পালিয়ে যেত। কিন্তু প্রশাসনের ও সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশি।

মোঘল আমলে জমিদারদের সাথে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর জমিদারদের অনেক পার্থক্য আছে। তাদের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছিল জমি থেকে প্রজাকে উচ্ছেদের ভয় দেখানো। কৃষি অর্থনীতি ও স্বয়ম্ভরতা পাশাপাশি অবস্থান করতো।

অর্থনৈতিক কারণে গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি গ্রামে কয়েক ধরনের হাতের কাজের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত জরুরী। প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠতো এমন একটি সমাজ যেখানে লোকসংখ্যা বাড়লে একই ধরনের আর একটি সমাজের জন্ম দিতে পারবে।

মধ্যযুগে জমিদার শব্দটি পাওয়া যায়। এটি একটি ফার্সি যৌগিক শব্দ। এর অর্থ হলো – যার জমি আছে। তালুকদার কথার অর্থই জমিদার। কোনো জমি উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ হতে পারতো কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্যে রাজার দেওয়া জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। জমিদারের মৃত্যুর পর ঐ জমি সরকারের হাতে চলে যেত। এই জমিদাররা কেন্দ্রীয় শাসন কর্তার নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহ করে দিতো আবার নিজেরাও প্রভূত অতিরিক্ত রাজস্ব দাবি করতো। এই জমিদাররা পদাতিক বাহিনী (প্রাইভেট আর্মি) ও তৈরি করতো।

মধ্যযুগে চাষীদের উৎপন্নের উদ্বৃত্তে জমিদাররা ভাগ বসাতো, এই অর্থে তারা ছিল শোষকশ্রেণী। শ্রেণী হিসেবে জমিদাররা গড়ে উঠেছিল কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী নিয়ে। যারা অনেকদিন ধরে পরস্পরকে পদানত করে রাখত। জমিদার শ্রেণী নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। এরা ঐক্যবদ্ধ শাসকশ্রেণীর রূপ নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি। এই কারণে এটা বিদেশী আক্রমণকারীদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল। মধ্য যুগে জমিদারি ক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধরা হতো। জমিদারদের অধিকার নিয়ে ঝগড়া হলে ফয়সালা হতো আইনের আশ্রয় অর্থাৎ ‘কাজী মারফৎ’ অথবা তার সাহায্যে। নিয়মিত রাজস্ব না দিলে ও বিদ্রোহ করলে জমিদারদের বরখাস্ত করা হতো।

ভূমি রাজস্ব দিতে অস্বীকার করাই ছিল কৃষকের প্রথম প্রতিবাদ। অত্যাচার বেশি হলে তারা বিদ্রোহ করতো।

৩০০ বছর আগে জাতপাত প্রথা চাষীদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একই জাতের লোকেরা অনেক সময় বিদ্রোহ করতো। জাঠ বিদ্রোহ, মেওয়াটী, ওয়াত্তু, দোগার এরা বিদ্রোহ করেছে। এছাড়া ধর্ম আন্দোলনে গড়ে ওঠা কিছু প্রগতিশীল চিন্তাধারা যেমন – জাতপাত ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা, নতুন ও গ্রহণযোগ্য কোনো ধর্ম-বিশ্বাসের অধীনে একতা বোধ জেগে ওঠে। মোঘলদের বিরুদ্ধে দুটো শক্তিশালী বিদ্রোহ প্রেরণা যুগিয়েছিল ধর্মীয় ঐক্যে।

সৎনামী ও শিখ বিদ্রোহ

কৃষকদের বিদ্রোহে কিছু শ্রেণীগত অস্পষ্টতা ছিল। তার কারণ বহু ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহে জমিদাররা অংশগ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব দেয়। কৃষক বিদ্রোহ গড়ে ওঠার কোনো এক

পর্যায়ে জমিদারদের হাতে নেতৃত্ব চলে এসেছিল বা তাদের নিজেদের নেতারাই জমিদারে পরিণত হয়েছিল নয়তো একেবারে প্রথম থেকেই চাষীদের মরিয়া ভাব অসন্তুষ্ট জমিদারদের বিদ্রোহে টেনে এনেছিল। বাদশাহী ক্ষমতার সাথে অসম প্রতিযোগিতায় জমিদারদের যে দুরবস্থা হতো তার ফলে তাদের চাষীদের প্রতি একটি আপোষমূলক মনোভাব তৈরি হয়েছিল। তবে সব বিদ্রোহেই জমিদারদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন না, আবার জমিদারদের সংমিশ্রণেই চাষীরা সমর্থন করেছিল তাও না।

আগ্রা এবং মথুরায় যমুনার দুই তীরেই চাষীদের ক্রমাগত বিদ্রোহ হতো। সাধারণ, জাঠ জাতির লোকেরা এখানে বাস করতো। ঔরঙ্গজেবের আমলে তালপত-এর জমিদার গোকুল জাঠের নেতৃত্বে প্রথম জাঠ বিদ্রোহ হয়।

গুরু হরগোবিন্দ সিং (১৬০৬-১৬৪৫)-এর অধীনে শিখরা একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। সৈন্যবাহিনী তৈরি করে মোঘলদের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। **শিখদের সম্মানিত সর্দারদের অধিকাংশই ছিল নিম্ন শ্রেণীর লোক**। ছুতোর, মুচি, জাঠ প্রভৃতি নিচু শ্রেণীর লোকেরাই ছিল এই বিদ্রোহের মেরুদণ্ড। প্রথমদিকে শিখ ধর্মের প্রথম সমর্থক ছিল ব্যবসায়ীরা। শেষ পর্যায়ে প্রধান হয় জাঠরা। শিখ বিদ্রোহের তৃতীয় পর্যায়ে নেতা হয়েছিলেন বান্দা। তখন মোঘল সম্রাট ছিলেন বাহাদুর শাহ ও ফারুকশেয়ার। রবীন্দ্রনাথের বন্দী-বীর কবিতায় বান্দার বীরত্বের কাহিনী লেখা আছে।

১৫৭৫-১৫৭৬ সালে মঞ্চা উপজাতির লোকেরা রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও কর সংগ্রাহকদের হত্যা করে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মেওয়াটাদের বিদ্রোহ, ১৬৩৫ সালে সাজাহানের রাজত্বে বন্দীদের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। মোঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য সবচেয়ে বড় একক শক্তি হিসেবে মারাঠা বিদ্রোহ বড় ভূমিকা পালন করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শিবাজী। শিবাজী ছিলেন এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। মারাঠাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতির মধ্যেই জমিদারি উৎসে গভীরতর ছাপ রয়েছে। মারাঠা লুঠেরাদের প্রথাগত এক চতুর্থাংশের দাবি চৌথ এসেছিল।

কোচবিহার আসাম সীমান্তে বারবার বিদ্রোহ হতে থাকে। প্রথম বিদ্রোহ হয় রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে, দ্বিতীয় বিদ্রোহ হয় হাতি ধরার অধিকারের জন্য। ঔরঙ্গজেবের আমলে উত্তর প্রদেশের আমেথি অঞ্চলে কুরমী-কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহে ধর্মের কিছুটা ভূমিকা থাকলেও বিদ্রোহ মূলত ছিল জমিদার বিরোধী। মেদিনীপুরে ঘাটালে দাসপুর অঞ্চলে জমিদার শোভা সিং-এর বিদ্রোহ।

সাব অলটার্ন ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র কৃষক বিদ্রোহে জমিদারদের নেতৃত্ব সম্পর্কে পৃথক মত পোষণ করেন। তার বক্তব্য মোঘল আমলে বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে কতগুলো সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায় – (ক) বিশুদ্ধ কৃষক বিদ্রোহ (খ) বিশুদ্ধ সামন্ত বিদ্রোহ (গ) জমিদার ও কৃষক বিদ্রোহ (ঘ) উপজাতিদের বিদ্রোহ (প্রতিবাদী আন্দোলন ও জাতে ওঠার প্রশ্ন সহ)

মধ্যযুগে কৃষকদের বিদ্রোহগুলিতে কৃষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকলেও জমিদাররা তাদের স্বার্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষকদের ব্যবহার করেছে। এই বিদ্রোহগুলিতে যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় গ্রামের উচ্চতম শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব ছিল।

গ্রামের সম্পন্ন চাষী এবং দরিদ্র চাষীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বজায় ছিল না। কিন্তু গ্রামের কৃষক চেতনায় এটা পরিস্ফূট হয়নি। বর্ণবিভেদ ও সামাজিক বিন্যাস এতো ব্যাপক ছিল যে আত্মচেতনার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসনে আমরা যে অজস্র কৃষক বিদ্রোহ দেখতে পাই তার ধারাবাহিকতা মোঘল আমল এমনকি সুলতানী (মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে 'দোহাবোর' কৃষক বিদ্রোহ) আমল থেকেও ছিল।

ইউরোপীয় ইতিহাস এবং মার্কস ও এশিয়াটিক মোড

কার্ল মার্কস ও ভারত

কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে লিখেছেন ১৮০০ সালের তিন দশক ধরে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশক। ১৮৫০ সাল থেকে লেখা শুরু হয়। ১৮৫৩ সালে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে যোগদানের পর ধারাবাহিকভাবে ভারত সম্পর্কে লেখেন। **তার লেখার প্রধান সূত্র ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাগজপত্র, গেজেট, ও তথ্যাবলী। তারপর দেড়শ বছর ধরে নানা নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে। পুরনো ধারণাও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এমনকি তিন দশক ধরে মার্কসের লেখার মধ্যেও পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তন এসেছে।**

ভারতে রজনীপাম দত্তের India To-Day বইটির প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারত সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মধ্যে চর্চা শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে এই চর্চা নতুন উদ্যমে শুরু হয়। ডি ডি কোসাম্বী ছিলেন পথিকৃত। রোমিলা থাপার, সুকুমারী ভট্টাচার্য, আর এস শর্মা, ইরফান হাবিব এবং আরও অনেকে।

মার্কসের লেখার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কসের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছেন। ঐ ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিলে ভারত সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যত রূপরেখা আলোচনা আমাদের আজও ঋদ্ধ করে যায়।

মার্কস : "ভারতের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা হল ধারাবাহিক অনুপ্রবেশের ইতিহাস। অপ্রতিরোধী, অপরিবর্তনশীল সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিতের ওপর তারা, অর্থাৎ আক্রমণকারীরা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।" (মার্কস, এঙ্গেলস: 'অন কলোনিয়ালিজম)। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী গ্রামে দুটো অংশে বিভক্ত ছিল। একদিকে শান্তিরক্ষক, বিচারক, পেশাভিত্তিক কর্মী সকলেই আয়ের সমানুপাতিক ভাগ পেত। অন্যভাগ পেত রাজা। এই বণ্টনব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় ছিল। কারো কোনো ইচ্ছাতেই নড়চড় হত না। আর মার্কস লিখেছিলেন ভারতের জনগণ 'খানিকটা জমির টুকরো পেলেই খুশি। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, অকথ্য নিষ্ঠুরতার অপরাধ, বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড – শান্তচিত্তে এসব কিছুরই সাক্ষী হয়ে থাকত। একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া তাদের জীবনে নেমে আসা আর কোনো অভিশাপকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।

সেচ ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্র রাজ্য গোষ্ঠীর হাতে। শুধু যদি কেন্দ্রের হাতেই সেচ ব্যবস্থা থাকত – তাহলে কেন্দ্রের অনেক আধিকারিক থাকত, একটা আমলাতন্ত্র থাকত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ৩০ জন বিভাগীয় কর্তা এবং ১৮ জন অফিসারের কথা জানা

যায়। তারা অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু সেচের দায়িত্বে ছিলেন না। গুপ্ত বংশের ক্ষেত্রে সেচ ছিল রাজ্যের দায়িত্বে। সেচের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত দায়িত্বের সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে।

'প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব' খাড়া করা হয়েছে ব্রিটেনের ভারত শাসনকে তাত্ত্বিক মান্যতা দেবার জন্য।

গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে কদাচিৎ। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বা মারী মড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমনকী বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ এমনকী একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি, ভাগ-বিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথা ঘামায়নি। তাদের কাছে গ্রামটি অখণ্ড থাকলেই হল। কোন শক্তির কাছে তা গেল, কোন সম্রাটের তা করায়ত্ত হল, এ নিয়ে তারা ভাবে না। সেই প্রধান মণ্ডল, সেই ক্ষুদ্র বিচারপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে এখনো চালিয়ে যায়।

কিন্তু গ্রাম অপরিবর্তনীয় এই কথাটি ভুল। কারণ গ্রাম ব্যবস্থা থেকেই নগর বন্দর তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রও তৈরি হয়েছে। হাল ব্যবহার একটি পরিবর্তন। কোনও সময়ে মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল, কোনো সময় ছিল না। লোহার লাঙল, ভূমিদান, ট্রাইবাল সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্র, ট্রাইবাল রাষ্ট্র, সামন্ত রাষ্ট্রে – এ সবই পরিবর্তনের লক্ষণ। পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ কেমন করে হবে। নুন, ধাতু বেশিরভাগ গ্রামেই বাইরে থেকে আনতে হতো।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আগে তোমাদের হাতে জমির মালিকানা ছিল না। আমরাই তোমাদের দলিল করে দিলাম। বেশ কিছু জমির সন্ধান মেলে – যেমন সীতা জমি। ব্রিটিশ আমলে থাকত খাসমহল। জমির ওপরে রাজারও কিছু স্বত্ব থাকত। সীতা জমিতে খাজনা দিতে হত। প্রাক মধ্যযুগে অন্তর্বর্তী জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয় এবং জমির ওপরে রাজার ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে যাদের জমি দান করা হত তারা সব অধিকারই পেত – ট্যাক্স আদায়, উচ্ছেদ করা সব ক্ষমতা তার ছিল। একে বলা হয় জমিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক।

জমি নিয়ে কোনো বিরোধ হলে রাজার সনদ গ্রাহ্য হত।

মার্কসের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ – ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলতেন যে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিময় প্রথা চলত পারস্পরিক ভিত্তিতে। কিন্তু আসল তথ্য হল জমির আয় থেকে কর যেত কেন্দ্রে। শহরে পরিবারদের অথবা গ্রামীণ কারিগরদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী শহর ও গ্রামের চাহিদা মেটাত।

খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক পর্যন্ত বহু নগরের অস্তিত্ব ছিল। তারপর একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়। কারণ প্রাক মধ্যযুগের সময় থেকে নগর ও কারিগরি ব্যবস্থার অবনতি হতে শুরু করে এবং কারিগররা গ্রামে চলে যেতে শুরু করে। ফসল তোলার পর কারিগরদের চাহিদা গ্রামবাসীরা মিটিয়ে দিত। ভারতের মন্দির ও বড় বড় ভূস্বামীরা কারিগরদের কাজ দিত।

মালিকই যদি না হন তাহলে রাজা কোন অধিকারে কর বসাতেন? আবুল ফজল কর বসানোর সপক্ষে বলেছিলেন – বাদশাকে দেশরক্ষা করতে হয়, নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে হয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হয়। এটা তারই বাৎসরিক পারিশ্রমিক। প্রজাদের

রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেই এই কর। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজা বা সুলতান কখনোই জমির অধিকার দাবি করেননি।

ঔপনিবেশিক যুগ

ভারতের সমাজ বিকাশের ধারায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উত্তরসূরী হিসেবে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠেনি। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের অর্থনীতিকে পৃথিবীজোড়া পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসনে জুতে দেওয়া হয়েছে। পুঁজি সংগ্রহের অন্যতম উপাদান ঔপনিবেশিক পরিবেশ ও লুট। ওটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় না।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার দুটি মূল কারণ দেখানো হয়েছে। একটি মার্কসবাদী ও অন্যটি অনেক ঐতিহাসিকদের মত। মার্কসবাদীদের মতে উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সম্পদ লুট করার জন্য। অন্য মত কিছু ইতিহাসবিদরা বলেন বাণিজ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে বণিককুল উঠে এসেছিল তারাই (যেমন জগৎ শেঠ) নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক প্রাণকেন্দ্রের তাগিদ নয় প্রান্তীয় অঞ্চলে দেশীয় পুঁজির মালিকরাই ইংরেজদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

রজনীপাম দত্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে তার শোষণ পদ্ধতির ভিত্তিতে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন (১) গোড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম ৫০-৬০ বছর (১৭৫৭-১৮১৩) সময়কাল ছিল মহাজনী পুঁজি (Marchent Capital)-এর সময়কাল। (২) ঊনবিংশ শতকে ছিল শিল্প পুঁজির (Industrial Capital), (৩) ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে লগ্নি বা বিত্ত পুঁজি (Finance Capital) বিকাশ ঘটলে ভারতে উপনিবেশিক শোষণের চরিত্র বদলে যায়। কিন্তু ৩ ধরনের শোষণই ছিল। আগের ধরনের শোষণগুলি বিলুপ্ত হয়নি। প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাদারেরা আফ্রিকা থেকে দাস এনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্প্যানিস আমেরিকায় বিক্রি করে যে রূপো অর্জন করতো তাই দিয়ে তারা ভারতে ব্যবসার কড়ি সংগ্রহ করতো।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার রূপো, আফ্রিকার দাস ব্যবসা ও ভারত লুণ্ঠন করে যে পুঁজি সংগৃহীত হয় তা দিয়েই সেই সঞ্চিত পুঁজি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করে।

ঔপনিবেশিক যুগে কৃষক আন্দোলন : ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তনের শুরু থেকেই কৃষকরা হিংসাত্মক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। কৃষকদের এই বিদ্রোহগুলোকে মার্কসবাদী গবেষক ও নৃ-তত্ত্ববিদ্ ক্যেসলিন গাফ বিদ্রোহগুলির প্রাথমিক চরিত্র অনুযায়ী তাদের কতকগুলি ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) পুনঃস্থাপনবাদী (Restoretion) আন্দোলন ১৯৯৭-এ মেদিনীপুরে চোঁয়াড় বিদ্রোহ থেকে শুরু করে বেনারসে চৈত সিং বা তামিলনাড়ুর বলিবীর বিদ্রোহের পেছনে চালিকাশক্তি ছিলো আগের জমানায় ক্ষমতাভোগী শ্রেণী যারা ইংরেজদের নতুন শাসনে ক্ষমতা হারিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাষীরা নিজেরাই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু বিদ্রোহগুলির পেছনে ধর্মীয় আবেগ অনুঘটকের কাজ করেছে। যেমন—রঙপুরের বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরাজী আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার জন্য কিছু আন্দোলন হয়েছে। যেমন—আদিবাসীদের আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ইত্যাদি বিদ্রোহগুলিকে কোনো সাধারণ সূত্রে বাঁধা যায় না। ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু হবার পর প্রকৃত চাষীরা সবাই ভাড়াটে চাষাতে পরিণত হল ও জমিদারদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল খাজনা না দিলে তাদের উচ্ছেদ করার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করেন। কোম্পানী প্রথমদিকে জমির প্রকৃত উৎপাদন কত হতে পারে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে জমি জরিপ করা ফসলের দাম সম্পর্কে তত্ত্ব জোগাড় করা ইত্যাদির সরল সমাধানের জন্য, খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেবার জন্য জমিদারি নিলামে তোলে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যারা জমিদারি কিনবে তাদের নিশ্চই খাজনা আদায়ের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু যারা নিলেন তারা এতো বেশি অত্যাচার করে খাজনা আদায় শুরু করলো এর ফলে জমি ছেড়ে কৃষকরা পালিয়ে গেল ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল (১৭৬৯)। এই অভিজ্ঞতার ফলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমি নিলাম করেন এবং যারা জমি কেনেন তাদের জমির মালিক বা জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাজস্বের জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক ঠিক হয়। তার হিসেব দাঁড়িয়েছিল জমিদারদের আদায়কৃত রাজস্বের নয় দশমাংশ কোম্পানিকে দিতে হবে। বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব কোম্পানির ঘরে জমা দিলে জমিদাররা বংশানুক্রমে জমির স্বত্ত্বাধিকারী থাকবে। এখন থেকে জমিদাররা ইচ্ছামতো তাদের জমির ক্রয়-বিক্রয় সব কিছুর অধিকার লাভ করলো ও কোম্পানির মিত্র হিসেবে পরিগণিত হলো। এর ফলে কোম্পানির লাভ হল নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা নিশ্চিত করা ও কৃষক বিদ্রোহ দমন।

একটা নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এই নতুন জমিদাররা ছিল সাধারণ ব্যবসায়ী এবং মুৎসুদ্দি। এরা হয়ে গেল দেশের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে শাসন কাঠামোয় একটা নতুন শ্রেণী। ইংল্যান্ডের শাসনের সাথে জমিদারি শক্তির মিলন ভারতের ইংরেজ শাসনের সামাজিক ভিত্তি রচনায় এক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। সরকার নিজেও কিছু জমি দখলে রেখেছিল, তাকে বলা হতো খাসমহল।

মাদ্রাজ ছাড়া বাংলা, বিহার, ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু ভারতের অন্যত্র **আরও ৩ ধরনের ব্যবস্থা ছিল—রায়তওয়াড়ি, মহল-ওয়াড়ি, পাঞ্জাবে ভাইয়াচারী** এই তিন ধরনের ব্যবস্থাতেই রাজস্ব হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা ছিল। এই নতুন ব্যবস্থাগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের থেকেও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ইংরেজ আমলে দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষ – মৃত ৫০ লক্ষ

১৮৬০-১৮৭৯ – দুর্ভিক্ষ ১৬ মৃত ১ কোটি ২০ লক্ষ

১৮৮০-১৯০০ – ৩৪ বার দুর্ভিক্ষ মৃত ১ কোটি ১৯ লক্ষ

কৃষক বিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহ

প্রথমদিকে জমিদার এবং কৃষকরা একসঙ্গে বিদ্রোহ করে।

পরে কৃষক-জমিদার দ্বন্দ্ব বাড়ে। কৃষকদের বিদ্রোহ হয়। জমিদারদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।

১৭৯৮-১৮১৬ চুয়াড় বিদ্রোহ রানী শিরোমণি নেত্রী

সাঁওতাল বিদ্রোহ : ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৫৫-৫৬, ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫, ১৮৮০-৮১

– মূল লক্ষ্য বিদেশী শাসন মুক্তি। সাঁওতালরা দুর্গম বনাঞ্চল পরিষ্কার করে (এখনকার সাঁওতাল পরগনা) চাষআবাদ শুরু করে। সুযোগ নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা হাজির হয়। সাঁওতালদের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা– ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই।

তিতুমির – ১৮৩০-৩১, বাদুড়িয়া ওয়াহাবী বিদ্রোহ

ফরাজী বিদ্রোহ – ফরিদপুর জেলা দুঁদু মিয়া (১৮৩৮-১৮৪৮)

মহাবিদ্রোহ

ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ।

সিপাহী বিদ্রোহ নাম হলেও উত্তর ভারতের কৃষকদের ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ।

কৃষকদের অনেক অভাব-অভিযোগ ছিল। সাধারণ মানুষের একাংশ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন।

অভিজাত শ্রেণীর একাংশ বিদ্রোহের নেতৃত্ব।

বিদ্রোহের ঠিক আগে লর্ড ডালহৌসির আমলে অযোধ্যা, ঝাঁসি, সাতারার মতো রাজ্যগুলো অধিগ্রহণ করা হয়।

বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে বিদ্রোহ

তারা নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেননি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেন। তারা প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে ফেরত যেতে চাইছিলেন। (পৃঃ ১৩৬)

কোম্পানি শাসন থেকে ব্রিটিশ সরকারের শাসন।

ক্যানিং রাজন্যবর্গকে জমিদারি ফিরিয়ে দিলেন। জমিদারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপন হলো।

বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্যের পর গণশাসন প্রতিষ্ঠার পরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভাঙন

জমিদারদের নিজশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা।

বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করাতে মারাঠিরা ক্ষুব্ধ হয়।

জমিদাররা রাজত্বে ফিরে যাবার পরে বিদ্রোহ থেকে সরে এলেন।

মহাবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ছিল :

১। শ্রেণীগত ও ধর্মীয় বিরোধগুলোর ঐক্য—মূল উদ্দেশ্য ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ—এ

থেকেই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচিত হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই মুসলমান শাসককে নেতা নির্বাচিত করে।

২। ভারতের প্রথম এবং একমাত্র গণবিদ্রোহ যাতে জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়েছিল।

৩। কিছুদিনের জন্য হলেও রাজনৈতিক সাফল্য।

৪। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, নতুন গড়ে ওঠা মধ্যশ্রেণী এবং ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনে দুর্ভিক্ষের কারণ :

১। ব্রিটেনের অধিবাসীদের জন্য বছরে প্রায় ৬ মাসের খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য অফুরন্ত কাঁচামাল প্রেরণ–

২। ভারতের সেচ ব্যবস্থা মোগল আমলের শেষদিকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের জন্য ও ব্রিটিশ আমলের ঔদাসীন্যের জন্য প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। পরপর দুর্ভিক্ষের কারণ।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও নয়া সামন্ততন্ত্র মিলে মিশে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্ততন্ত্র ছিল ব্রিটিশ সরকারের খুবই অনুগত।

কিন্তু প্রথমদিকে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জমিদার ও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই জমিদার ও কৃষক মিলিত বিদ্রোহ হয়। পরবর্তীকালে জমিদারদের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। এই বিদ্রোহগুলি ভারতের প্রাচীন সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও শ্রেণীদ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোভাব অবলম্বন করে এক বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা বিদ্রোহগুলিতে প্রেরণা দিয়েছে। বাংলাদেশের ফরাজী আন্দোলন, মালাবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ এবং আদিবাসী বিদ্রোহগুলিতে আমরাও সামাজিক প্রতিবাদ ও ধর্মীয় চেতনার সম্মিলন পাই।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বৈষম্য বাড়ে ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্বও বাড়ে।

নীল বিদ্রোহ প্রথমে জমিদার ও কৃষক একযোগে আন্দোলন করে।পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকরা খাজনা দিতে পারে না–তাই জমিদাররা পিছু হটে। ১৮৭৫ সালে খাজনার জন্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব বাড়ে।

মালবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকের দ্বন্দ্ব। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নয় – শ্রেণীদ্বন্দ্ব

ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্রোহ আছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালের কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট বিশেষত্ব আছে।

কৃষক সভা ও কৃষক সংগ্রাম ও শ্রেণীচেতনা

১৯৩২ সালে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার পর কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কৃষকসভা জন্মলাভ করে। কৃষকসভার এই নেতৃত্ব এসেছিল সরাসরি লালপতাকা নিয়ে। জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন এবং শ্রেণীর লড়াইয়ে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে জোট গঠন, জাতীয় মুক্তি এবং কৃষি বিপ্লব

কৃষকসভার ঘোষিত লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।

এরফলে অনেকগুলো ছোট বড় এবং বিশাল কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সহযোগী জমিদার ও সামন্তদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯৩৬-এর আগেই মালাকারের মোপলা বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৩৬-৯৮ এবং এরপর ১৯২০-২১ সালে। ১৯২১ সালে সরকারিভাবে ২৩৩৭ জন বিদ্রোহী নিহত। ১৫৫২ জন আহত এবং ২০০০০ জনকে নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসিতদের বেশিরভাগ পাঠানো হয় আন্দামানে। ৪৫৪০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি হিসেবে ১০০০০ নিহত, ৫০০০০ কারারুদ্ধ এবং অসংখ্য নিখোঁজ। জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল।

সুরমা উপত্যকায় ১৯৩৮ সালে কৃষকরা জমিদারের খাজনা আদায় বন্ধ করে দিয়েছিল এবং প্রজাস্বত্বের দাবি করে। আন্দোলন দীর্ঘদিন চলে। সিলেট আইনসভা প্রজাস্বত্ত্ব বিল আনতে বাধ্য হয়। এটা কৃষকদের একটা সাফল্য।

বাংলার জেলায় জেলায় 'উত্তাল তেভাগা' কৃষক আন্দোলন হয় উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দু'ভাগ দাবিকে কেন্দ্র করে। ফসল কেটে জমিদারের গোলায় না রেখে নিজের খামারে রাখা ছিল একটি প্রধান দাবি। জোতদার পুলিশ ও গুণ্ডা লাগিয়েছিল। বর্বর অত্যাচার চালায়। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার ১৩টি জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সারা রাজ্যে পুলিশের গুলিতে ৭২ জন কৃষক মারা যায়। গ্রেপ্তার হয় অসংখ্য। ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইন তৈরি হলেও তা জোরদারের চাপে কার্যকর হয়নি। ১৯৫৩ সালে State Acquisition Bill প্রণীত হয় আইনসভায়। সেই বিল এনে সরকার সমস্ত জমিদারি নিয়ে নেয় এবং রায়ত ব্যবস্থা চালু হয়। তেভাগা আন্দোলন ভারতে কৃষক সংগ্রামে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৪৫ সালে মুম্বাইয়ের থানা জেলায় গোদাবরী পারুলেকরের নেতৃত্বে ওয়ারলি আদিবাসীদের গণসংগ্রাম হয়েছিল। ঋণের দায়ে আদিবাসীরা কর্জদাসে পরিণত হয়েছিল। আদিবাসীরা ঋণ দাসদের মুক্ত করে। দাবি আদায় হয়। ২০০-র ওপর গ্রামের এক লক্ষ কৃষক এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালে ঐ অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা সৈন্য পাঠায় এবং বহু ক্ষেত্রে গুলি চালায়। এই সংগ্রামের ফলে ওয়ারলিরা রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়। এই লড়াই ছিল জোতদারদের বিরুদ্ধে ওয়ালরি শ্রমজীবীর শ্রেণীসংগ্রাম এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একটা ধাপ।

পুন্নাপ্রা ভায়লারের সংগ্রাম হয় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। এই রাজারা ভারতে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকতে চেয়েছিল। এরা খেতমজুরদের ওপরে ঋণের দায় চাপাতো। তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা, কাজ থেকে ছাঁটাই করা হতো, ভিটে থেকেও উচ্ছেদ করা হতো। কৃষিমজুর, দড়ি কারখানার শ্রমিক, জেলে, দলিত চাষীদের লড়াই একসঙ্গে সংগঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটা কোণায় লালঝাণ্ডা ওড়ানো শুরু হয়। শ্রমিক কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই সংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

১৯৪৬ সালের অক্টোবরে সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে শ্রমিক কৃষকের মুখোমুখি লড়াই হয়। অনেক শ্রমিক-কৃষকের প্রাণ যায়। মজার ব্যাপার হলো, স্বাধীনতার পর

কংগ্রেস ঐ দেশদ্রোহী রাজাদের আদরে নেতৃত্বে বরণ করে নেয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক।

ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব

রেল একমাত্র শিল্প যা ব্রিটিশ পুঁজি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার উৎস ছিল ভারতীয় রাজস্ব। **নির্মাণ কাজের জন্য যে বিশাল শ্রমিকবাহিনী দরকার হয়ে পড়েছিল তারাই ছিল দেশের প্রথম সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী।** ১৭৭০ কয়লা আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হলো। সওদাগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। রপ্তানির প্রয়োজনে আটাকল, ছাতাকল, তুলো থেকে সুতোকল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে।

১৮৬০ সালে প্রথম চট কারখানা রিষড়াতে। ১৮৮৬ সালে প্রথম চটকল মালিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন। ১৮১৮ সালে বাউরিয়াতে প্রথম সুতোকল। তুলার প্রাচুর্যের জন্য মুম্বাইতে ২৫ বছরে ১৮টি সুতাকল তৈরি হয়। সুতাকলে ছিল ভারতীয় মালিকানা।

১৯১৩-১৪ সালে চটকলে ২ লক্ষ ১৬ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালের মধ্যে ১৯৭টি সুতাকলে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার শ্রমিক ছিল। ৫৯৪টি কয়লাখনিতে ছিল ১ লক্ষ ২৮ হাজার শ্রমিক। ১ লক্ষ রেলশ্রমিক ছিল। ১৯১৪ সালে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কারখানার সংখ্যা ছিল ২৯৩৬। এরসঙ্গে যুক্ত ছিল প্রায় ৯ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিক। ১৯২৮ সালে চা বাগানে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৬ হাজার ৫৫৭। বিদ্যুতের আলো থাকলে কাজ হতো ১৫ ঘণ্টা, নাহলে বারো ঘণ্টা। সেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত।

১৮৪২ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে জাহাজের খোলে ভর্তি করে মরিশাস ব্রিটিশ গায়না, জামাইকা, ত্রিনিদাদ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫১৫ জন শ্রমিককে আড়কাঠির সাহায্যে অমানবিক পন্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইংরেজ শাসন প্রসারের ফলে ভারতে অনেক মুৎসুদ্দী দোভাষী হিসেবরক্ষক কর্মচারী ইংরাজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এবং জমিদারদের অধীনে কাজ করত। এরা অনেকে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল এবং তারাও কিছু কারখানা তৈরি করে। বণিক, মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের এই অংশটাই ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রথমবাহিনী।

ইউরোপীয় শ্রমিকরা সরাসরি হস্তশিল্পী থেকে শ্রমিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতে হস্তশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে কৃষিকাজে ফেরত যেতে হয়েছিল। দু তিন প্রজন্ম বাদে তারা পূর্বপুরুষদের দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। কৃষক পরিবার তারা সরাসরি শ্রমিক হিসাবে যোগ দেবার ফলে তাদের সমস্ত অভ্যাস, সংস্কারগ্রস্ত আচার, জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার এইসব কিছু নিয়ে তারা শ্রমিকশ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ফলে একটা অন্তর্নিহিত দুর্বলতা রয়েই গেল। সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশেই জাতপাত ছাড়া এই চিত্র বজায় ছিল।

ভারতে প্রথম রেল ধর্মঘট হয় রেল শ্রমিকদের ১৮৬২ সালে। ১২০০ শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেন। এর আগে ১৮২৩ সালে কলকাতার পালকি বেয়ারা ১৮৭৩ ও ১৮৭৬ সালে মুম্বাইয়ের মাংস বিক্রেতারা, ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ ২৫টি শিল্পে

ধর্মঘট হয়। বেশিরভাগ ধর্মঘটই ছিল মজুরি কমিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে। ১৯২০ সালে ভারতে ৫৮টা কারখানায় ৩ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। এইসময় ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২০ সালের মধ্যে ১২৫টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯২০ সালে এ আই টি ইউ সি গঠিত হয়।

১৯২৭ সালে এ আই টি ইউ সি-র সপ্তম সম্মেলনে এ আই টি ইউ সি-র লক্ষ্য হিসেবে Socialist Republic of Workers ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলন থেকে যে দাবিপত্র তৈরি হয় সেখানে ছিল :

১। সমস্ত জমি ও শিল্প জাতীয়করণ করা

২। সর্বজনীন ভোটাধিকার

৩। ধর্মঘটের অধিকার

এছাড়াও দাবি ছিল কোনো দেশীয় রাজ্য আর জমিদারদের হাতে থাকবে না। ১৯২৮ সালে প্রথম মে দিবস পালিত হয়।

১৯৪৫-৪৭ ভারত জোড়া শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনগুলি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পথ ত্বরান্বিত করে এবং ভারতে একটি বুর্জোয়া জমিদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঔপনিবেশিক যুগের শ্রমিক সংগ্রাম

ইংরেজ মসলিন কাপড়সহ বাংলার বস্ত্রশিল্প কার্যত ধ্বংস করে দেয় এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের কারবারের একচেটিয়া পথ করে দেয়। উপনিবেশ লুঠ করে ভারতের সনাতন অর্থনীতি ধ্বংস করে মানুষকে আফ্রিকার দাস বানিয়ে শ্রমশক্তি নিঙড়ে চীনকে আফিম ব্যবসায় বুঁদ করে পুঁজিবাদের জন্ম। প্রায় ৫০ বছর ধরে পৃথিবীর কোথাও ইংল্যান্ডকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৬৬৪ থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি ধীর। ১৭৬০ থেকে ১৮২০ অতি দ্রুত এবং বিস্ময়কর হারে অগ্রগতি ঘটে (বিনি পয়সার ভোজ)। পুঁজিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণী ভারতে বিকশিত হয়েছে অনেক পরে। মার্কসের কথায় : ভারত ছিল রপ্তানিকারক দেশ। হয়ে গেল আমদানিকারক দেশ। ব্রিটিশের পণ্য আসত বিনা শুল্কে, কিন্তু ভারত থেকে যে বস্ত্র রোমে যেত ৭০%-৮০% শুল্ক বসানো হয়েছিল। শুধু তাই নয় ভারতে ধাতু এবং অন্যান্য শিল্প একই কারণে ধ্বংস হয়, ভারত থেকে ব্রিটেনে কাঁচামাল যেত। কার্যত ভারত হয়ে দাঁড়াল কৃষিভিত্তিক এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের অবদান – ১৯৪০-৪৭ বিভিন্ন গণসংগ্রাম, নৌ বিদ্রোহ, আই এন এ বন্দীমুক্তি, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন। জমিদারদের সঙ্গে আপস করে বুর্জোয়া-ভূস্বামী রাষ্ট্র।

মার্কসের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল ছিল

১। টেলিগ্রাফ ও রেলপথের যোগাযোগ

২। শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়বে।

৩। রাজনৈতিক ঐক্য—জাতীয়তাবাদের বিকাশ। স্বাধীন সংবাদপত্রের মত প্রকাশের অধিকার।

শক, হুন, পাঠান, মোগল ভারতীয় সভ্যতায় মিশে গেছে। ব্রিটিশরাই প্রথম যারা হিন্দু সভ্যতা থেকে উন্নত। স্থানীয় গোষ্ঠী ভেঙেছে। স্থানীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছে।

–●–

পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবশ্য পাঠ্য

১। ডি ডি কোসাম্বীর বইগুলি (বাংলা)

২। রামশরণ শর্মার বইগুলি (ইংরাজী ও বাংলা)

৩। সুকুমারী ভট্টাচার্য- প্রাচীন ভারত। সমগ্র রচনাবলী।

৪। ইরফান হাবিব এর বইগুলি।

৫। রাজ্য কমিটি প্রকাশিত – ভারতের সমাজ সভ্যতা বিকাশের ধারা

৬। সুকোমল সেন – ভারতের ধর্ম, শ্রেণী

৭। শ্যামল চক্রবর্তী – ভারতের সমাজ বিকাশের ধারা